

ছোটদের
কথাসরিৎসাগর

নীরদ হাজরা

ছোটদের

কথাসরিৎসাগর

ডঃ নীরদ হাজরা

মন্ডল এন্ড সন্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীসুধীরকুমার মণ্ডল
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

প্রচ্ছদ ঃ
কুমারঅজিত

অন্যান্য ছবি
শিবব্রত রায়

মূল্য ঃ বারো টাকা মাত্র

মুদ্রক ঃ
স্বপনকুমার মণ্ডল
দি গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

॥ মুখবন্ধ ॥

এক

কথাসরিৎসাগরের সৃষ্টি এবং প্রচারের কাহিনীটি বেশ উপভোগ করার মত। সেই গল্প দিয়েই আমাদের বক্তব্য শুরু করা যাক।

একদিন স্বয়ং মহাদেব খুশি হয়ে পার্বতীকে কিছু উপহার দিতে চাইলেন। পার্বতী বল্লেন, আমাকে এমন কোন গল্প শোনান, যা অন্যে জানে না।

মহাদেব এই গল্পগুলি শোনালেন। পার্বতী মহাখুশি। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেবীর খুশি উবে গেল। এইমাত্র তাঁকে তাঁর প্রিয়সখি জয়া ঐ গল্পগুলিই শুনিয়ে গেছে। গল্পগুলি যদি মহাদেব স্বয়ং সৃষ্টি করে থাকেন আর দেবীই যদি তার একমাত্র শ্রোতা হয়ে থাকেন, তবে তা জয়া জানল কি ভাবে? তা হলে মহাদেব কি তাঁকে প্রতারণা করেছেন! ক্রুদ্ধা দেবী ছুটলেন মহাদেবের কাছে।

মহাদেব ধ্যানে জানলেন, কৌতূহল বশে জয়ার স্বামী পুষ্পদন্ড আড়ি পেতে শুনেছিল গল্পগুলি। সে গিয়ে জানায় তার স্ত্রীকে।

কি! দেবীর ঘরে আড়ি পাতা! পার্বতী ক্রোধে দিকশূন্যা হয়ে পুষ্পদন্ডকে অভিশাপ দিলেন মর্ত্তে মানুষ হয়ে জন্মাতে।

এবার শুরু হ'ল কান্নাকাটির পালা। পুষ্পদন্ড, জয়া এবং তাদের এক বন্ধু মাল্যবান বারংবার দেবীর কথা ক্ষমা চেয়ে দন্ডটিকে লঘু করে দিতে বলতে থাকল। এতে দেবীর রাগ কমল। তিনি বললেন, এ গল্পগুলি যখন পাঁচ কান হয়েছেই, তখন গল্পগুলি মর্ত্তভূমে প্রচারিত হ'ক এটাই তাঁর কামনা। এ বাসনা পূরণ হলেই পুষ্পদন্ড মুক্তি পাবে।

এবার পুষ্পদন্ড কৌশাম্বীতে জন্মগ্রহণ করল নাম হ'ল বররুচি। মাল্যবানও জন্মগ্রহণ করল মর্ত্তে—সুপ্রতিষ্ঠিত নগরে। নাম হ'ল গুণাঢ্য। এই গুণাঢ্যই প্রাকৃতে এই গল্পগুলিকে লিপিবদ্ধ করেছেন 'বৃহৎকথা' নামে এক গ্রন্থে। তার থেকেই এ গল্পগুলি ক্রমে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

দুই

এই প্রবাহে আমাদের গ্রন্থটি সর্বশেষ সংযোজন। আমরাও সমগ্র কথাসরিৎসাগরের কোন আভাস তুলে দিতে চাইনি। সমগ্র 'কথাসরিৎসাগর' কিশোর-পাঠ্য বিষয় নয়। বিশেষ করে উদয়ন এবং তার ছেলে নরবাহনদেবের কাহিনী বলতে গিয়ে প্রতিপদক্ষেপে যেভাবে উপগল্প সংযোগ করে মূলে গল্পের তরঙ্গ-বিক্ষোভ সৃষ্টি করা হয়েছে, তা আজকের বয়স্ক পাঠকেরও রস উপভোগের অনুকুল নয়। আমরা আজ রয়ে বসে আখ চিবিয়ে চর্বন সুখের সঙ্গে রসগ্রহণ করতে চাই না, আখ মাড়াই মেসিনে ফেলে গেলাসে করে রসটুকুই গ্রহণ করতে চাই। জটিল জীবনযাত্রা এবং বিজ্ঞানের বশে গতিবৃদ্ধিই বোধ হয় এই রস উপভোগ রীতি বদলে যাওয়ার কারণ।

আমরা এই পরিবর্ত্তিত মেজাজের কথা ভেবে কথাসরিৎসাগরের গল্পগুলির উত্তরাধিকার নতুন করে কিশোরীদের হাতে তুলে দিতে প্রয়াসী। এখানে মাত্র আটটি গল্পকে গ্রহণ করেছি। গল্পগুলিকে মূলের মত কোন সূত্রে গাঁথিনি—এগুলি প্রত্যেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আমরা গল্পগুলির কাঠামো গ্রহণ করেছি মূল থেকে। প্রত্যেকটি গল্পের একটি বিশেষ রস-নিষ্পত্তির লক্ষ্য স্থির রেখে স্বাধীনভাবে বর্ণনা করেছি। যদি পাঠক-পাঠিকার মনে গল্পগুলি ঠিকভাবে দাগ কাটতে পারে, তবে গৌরব গুণাঢ্য বা সোমদেবের। যদি ব্যর্থ হয় তবে সব দোষ আমার। তবে আমি যে স্পর্দ্ধাভরে যুগোপযোগী ভাষ্যরচনায় প্রয়াসী হয়েছি, তার পিছনে ভারতীয় সাহিত্য চিন্তার প্রেরণা ও সমর্থন আছে। আমার এ গ্রন্থ পড়ে কোন পাঠক পাঠিকা যদি আদৌ আনন্দিত হন, তবে বলব, মূলে এমন আনন্দ-আকর শত সহস্র গল্প আছে। 'কথাসরিৎ' সাগরের মতই বিশাল।

ইতি।

ডঃ নীরদ হাজরা

সুদক্ষিণা পল্লী ঃ অঙ্গনা
কৃষ্ণনগর। নদীয়া।
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

গল্পক্রম



পাটলীপুত্রের কথা

তখন বিম্বিসারের রাজত্বকাল। রাজগৃহে তৈরী হয়েছে নতুন রাজধানী। ঐশ্বর্যে, সুখে, বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে রাজগৃহ তখন ভারতের সেরা শহর।

এই শহরের খ্যাতি শুনে তিন ভাই এসেছিল সেখানে বিদ্যা অর্জন করতে। ওদের আদি বাড়ি ছিল দাক্ষিণাত্যে। ওদের বাবা-মা সেখান থেকে কনখলে গিয়েছিলেন সাধু সন্ন্যাসীর সংগ পেতে। সেখানেই তিন ভাইয়ের জন্ম হয়। বাপ-মায়ের মৃত্যু হ'লে, তিনজনে বিদ্যে শিখতে এলো রাজগৃহে।

লেগে থাকলে বিদ্যে শেখা এমন কিছু শক্ত নয়। তিন ভাই বারো বছরে পণ্ডিত হয়ে ভাবতে লাগল কি করা যায়! বড় ভাই বলল, আমরা এমনই হতভাগ্য যে আজও পিতৃগ্রাম দেখিনি। চল, সেখানে যাই। দেশভ্রমণও হবে, পিতৃগ্রামও দেখা হবে।

অন্য ভাইয়েরা ভাবল কথাটা মন্দ নয়। দেশভ্রমণ না করলে বিদ্যেটা পাকা হয় না, আবার পিতৃগ্রাম না দেখলে পারিবারিক ঐতিহ্যটাও জানা যায় না। অতএব দাদার প্রস্তাব মেনে নিল ওরা। তিন ভাই যাত্রা করল দাক্ষিণাত্যের দিকে।

সেকালে তো রেলগাড়ি ছিল না। যাওয়া ছিল হেঁটে বা গাড়ি-ঘোড়ায়। ওদের না ছিল ধন-রত্ন না গাড়ি-ঘোড়া। হেঁটেই চলল ওরা। খাওয়ার ভাবনা নেই। কারো দরজায় গিয়ে হাত পেতে দাঁড়ালেই হ'ল। ব্রাহ্মণকে কে না ভিক্ষা দেয়—সমাদর করে। তা ছাড়াও ওরা তো কম পণ্ডিত নয়—শাস্ত্র আলোচনায়, ব্যাখ্যায় গ্রামের লোক এত খুশি হয় যে, খাওয়া পরাতো সামান্য কথা ওদের ছাড়তেই চায় না। এর ফলে ওদের যাওয়ার সময় বেড়েই যেতে থাকল।

অবশেষে বছর দুয়েকের মাথায় ওরা এসে পেঁছাল দাক্ষিণাত্যের এক গ্রামে। সুন্দর গ্রাম। অদূরে সমুদ্র। নারকেল গাছের সার। গ্রাম দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল তারা। নামটাও সুন্দর গ্রামটার—চিনচিনি।

শুধু ওরাই মুগ্ধ হ'ল না, ভোজক নামে এক ব্রাহ্মণও ওদের দেখে মুগ্ধ হ'ল। প্রচুর জমি-জমা ছিল তাঁর আর ছিল তিন কন্যা। কাউকেই বিয়ে দিতে পারেন নি। সৎপাত্র কোথায়? কথায় কথায় ভোজক চিনে ফেললেন ওদের বাপ-মাকে। কয়েকটা গ্রাম পরেই ছিল তাঁদের বাস। বড় ধার্মিক মানুষ ছিলেন তাঁরা। এ ছেলে কটি তাদেরই সন্তান, এদিকে বিদ্যেবত্তাও কম নয়! ভোজক প্রস্তাব দিলেন, ওর তিন মেয়েকে তিনজন বিয়ে করে চিনচিনিতেই স্থায়ী হয়ে বসুক। শেষ বললেন, আমার এত সম্পত্তি ভোগই বা করবে কে? তোমরা আমার কন্যাদের বিয়ে করলে, সব সম্পত্তি তোমাদের দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত মনে তীর্থ যাত্রা করব।

ভাই তিনটি ভাবল, প্রস্তাব মন্দ নয়। এতো প্রায় রাজ্য এবং রাজ কন্যা একত্রে পাওয়া। পরিশ্রম করতে হবে না, অথচ সুখের শেষ নেই। ওরা রাজী হয়ে গেল।

বিয়ের পর সুখেই কাটতে লাগল দিন। ভোজক তার জমিজমার এমন ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যে, না দেখলেও কাজ চলে যেত। তিনভাই

মনের খুশিতে ঘুরত আর বাবুগিরি করত। করবে নাই বা কেন, আজ ভগবান মুখ তুলে তাকিয়েছেন—জীবনে কষ্টতো কম করেনি। আহা, বেচারারা! ভোজক মনে মনে এ সব ভেবে জামাইদের আরও সুযোগ দিতেন।

খুশি ভোজক কিছুদিন দেখে শুনে যাত্রা করলেন বান-প্রস্থে। ওদের বাবুগিরির বহর বাড়ল। দেখাশুনার অভাবে ফসল কমতে থাকল, ফাঁকি দিতে থাকল লোক জন—গোলা ক্রমেই শূন্য হয়ে আসতে থাকল।

এই অবস্থায় পরপর দুবার হ'ল অজন্মা। পরের বছর হাহাকার পড়ে গেল। দুর্ভিক্ষ। ভোজকের বাড়িতেও টানাটানি। নেই নেই —খাই খাই রব। গ্রাম গ্রামান্তরের লোকেরা এসেও জুটতে লাগল ওদের বাড়িতে। আসবেই বা না কেন! এমন দিনে ভোজক যে সকলকে সাহায্য করতেন। তোমরাই বা করবে না কেন?

তিন ভাই-য়ের সুখ মাথায় উঠল। বাবুগিরি তো নেই। অতিষ্ঠ হয়ে ওঠল ওরা। এক দিন রাত্রিশেষে ওদের দেখা গেল না বাড়িতে। খোঁজ, খোঁজ! অবশেষে বোঝা গেল ওরা পালিয়েছে।

প্রথম কয়েক দিন ভোজকের কন্যারা কান্নাকাটি করল। তারপর বেরিয়ে পড়ল স্বামীদের খোঁজে। প্রায় প্রতিজ্ঞা করল, পণ্ডিতদের খুঁজে বের করবেই।

কিন্তু দিন কয়েক পরেই তাদের যাত্রা বন্ধ করতে হ'ল। যজ্ঞ দত্ত নামে ভোজকের এক পুরোন বন্ধু থামালেন তাদের। নিজের বাড়িতে এনে তুললেন। বললেন, মেয়েদের পক্ষে এভাবে লোক খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। তোমরা আমার বাড়িতে থাক। আমি জামাইদের খুঁজছি।

মেয়ে তিনটিও এত দিনে বুঝেছিল যে, এভাবে বেরিয়ে পড়া খুবই বোকামি হয়েছে। তারা যজ্ঞ দত্তের যুক্তি মেনে সেখানেই থাকা উচিত মনে করে, থেকে গেল। সেখানেই বড় মেয়েটির এক ছেলে হ'ল। তিন বোন আর যজ্ঞ দত্ত—চার জনে ছেলেকে নিয়ে মেতে উঠলো।

মেতে উঠলে কি হবে, যজ্ঞ দত্ত তো ধনী ছিলেন না। কোন

ক্রমে খাওয়া জুটতো। তাতে মুখ বেড়েছে তিনটি। তারও পরে শিশুটি। শিশুর আদর যতই বাড়তে লাগল, নিজেদের খাওয়া পরায় ততই লাগতে লাগল টান। যজ্ঞ দত্ত ভাবতে লাগলেন, কি করে আয় বাড়ান যায়। মেয়ে তিনটি ভাবতে থাকলো, কি করে আশ্রয়দাতাকে সাহায্য করা সম্ভব!

এমন সময় একদিন তিন মা-মাসী একত্রে স্বপ্ন দেখল আকাশ থেকে নেমে এলেন এক মহাপুরুষ। তাঁর পরণে বাঘছাল, মাথায় জটা। জটায় চন্দ্রকলা। তিনজনেই চিনল, তিনি স্বয়ং মহাদেব।

মহাদেব বললেন, তোদের দুঃখ আমাকে বিচলিত করেছে। তাই আমি এসেছি! বলি শোন। এ পুত্রই তোদের দুঃখ দূর করবে। ছেলে বড় হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি প্রাতে এর শিয়রে অনেক স্বর্ণমুদ্রা পাবি তোরা। অপচয় করিস না। এ পুত্র রাজরাজেশ্বর হবে। এর নাম রাখিস পুত্রক।

বলতে বলতে আকাশে মিলিয়ে গেলেন মহাদেব। শিহরিত দেহে জেগে উঠল তিন বোন! এ কি! এ যে ঊষার আলোয় রাঙ্গা হয়েছে পূব আকাশ। ভোরের স্বপ্ন কি বৃথা যাবে! অবাক কান্ড, ছেলের শিয়রে স্তূপ করা সোনার চাকা! হা ঠাকুর! সত্যই কি তাহ'লে তুমি মুখ তুলে চাইলে! তিন মা শিশুকে বার বার চুমু দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরতে থাকল। বার বার বলতে থাকল পুত্রক, পুত্রক।

* * *

পুত্রক বড় হয়েছে। তিন মা আর যজ্ঞদত্ত চারজনে মিলে তাকে শিক্ষায় দীক্ষায় বড় করে তুলেছ। যেমন রূপ, তেমনই তার গুণ। ঐশ্বর্য্যও তার কম নয়। কিন্তু এক দুঃখ তার বাবা-কাকাদের খোঁজ নেই। কোথায় যে হারিয়ে গেছেন তাঁরা!

বৃদ্ধ যজ্ঞ দত্ত একদিন পুত্রককে ডেকে বললেন, শোন, আমি তোমার মায়েদের কথা দিয়েছিলাম যে তোমার বাবা-কাকাদের আমি খুঁজে বের করে দেব। কিন্তু তা আমি পারি নি। কারণ আমার অর্থ ছিল না। তোমার অর্থ আছে, তুমি পারবে।

পুত্রক বললে, কিভাবে পারব ?

বৃদ্ধ বললেন, তুমি ঘোষণা করে দাও যে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে তুমি একশ' করে স্বর্ণমুদ্রা দান করবে। কিন্তু তিন তিন জনকে একত্রে আসতে হবে এবং তাদের তিন ভাই হতে হবে।

পুত্রকের ভাল লাগল বুদ্ধিটা। এ ঘোষণা ছড়িয়ে পড়তে তিন তিন ব্রাহ্মণ ভাই একত্রে আসতে থাকল আর তিন শ'করে স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে যেতে থাকল। দেশ দেশে ছড়িয়ে পড়ল এমন অদ্ভুত দানের কথা। এক সময় এ সংবাদ পোঁছাল পুত্রকের বাবা-কাকার কানে। তারাও এলেন এবং যজ্ঞদত্ত প্রশ্নে প্রশ্নে বের করে ফেললেন তাদের পরিচয়। পুত্রক বাবা বলে জড়িয়ে ধরল বড় ভাইকে। পুত্রকের দান সার্থক হয়ে উঠল। পুত্রকের তিন মা আনন্দে কেঁদে ফেলল।

পুত্রকের ঐশ্বর্য দেখে তিন ভাইয়ের চোখ আনন্দে ছানাবড়া! এত ঐশ্বর্য তাদেরই পুত্রের? তবে শেষ দিনগুলো অতি সুখেই কেটে যাবে!

না। পুত্রক অপচয়ে রাজী নয়, অনাবশ্যক বিলাসিতাতেও অভ্যস্ত নয়। বিধাতা দিয়েছেন বলেই কি তাকে আত্মসুখে ব্যয় করতে হবে।

পিতা-পুত্রে বিরোধ বেঁধে উঠল। অবশেষে তিনভাই পুত্রককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে, নিজেরাই সব ভোগ করবার মন স্থির করলেন।

একদিন ওঁরা পুত্রককে ডেকে বললেন, সামনে পুণ্যতিথি। আমরা বিন্ধ্যবাসিনী দেবী দর্শনে যাব। চল, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

পিতা-পিতৃব্যের সঙ্গে তীর্থযাত্রা—পুত্রকের মনে হ'ল, এ বড় সৌভাগ্য। পুত্রক রাজী হয়ে গেল। সোৎসাহে যাত্রা করল সবাই।

অমাবস্যার পুণ্যতিথিতে মন্দিরে পোঁছাল তারা। নিবিড় অরণ্যের মধ্যে মন্দির। তায় অমাবস্যার অন্ধকার। গা ছম ছম করে। মন্দিরের অদূরে তিনজন বসে পড়ে বললেন, তুমি এগিয়ে যাও। আমাদের কিছু গোপন ব্রত আছে। তা সেরে আমরা মন্দিরে যাচ্ছি। তুমি অপেক্ষা কর গিয়ে।

গোপন ব্রতে বাধা নিতে নেই। পুত্রক এগিয়ে চল্‌ল। মন্দিরের দরজার কাছে আসতেই কজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। আচমকা হলেও পুত্রককে আয়ত্ত করা সহজ হ'ল না। পুত্রক তাদেরই একজনকে ধরে এমন ঘোরাতে থাকল যে তার দেহের বাড়ি খেয়েই উল্টে পড়ল অন্য দুজন। তিনজনই পুত্রকের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইল।

পুত্রক বল্‌ল, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করেছি ব'লে মনে পড়ে না। তবে তোমরা আমাকে আক্রমণ করলে কেন?

ওরা সব কথা খুলে বল্‌ল। পুত্রক শুনে বিস্মিত হ'ল যে, তার পিতা এবং পিতৃব্যরাই তাকে হত্যার জন্য গুপ্তঘাতক লাগিয়েছিলেন। মনে বড়ই আঘাত পেল সে। কিন্তু শোধ নেবার সংকল্পও তার কম জাগল না। সে লোকগুলোকে বল্‌ল, যাও। তোমাদের মুক্তি দিলাম। তবে যাওয়ার পথে ওঁদের বলে যাও যে তোমরা কাজ সম্পন্ন করেছ। ওঁদের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা নিয়ে ছাড়বে। বুঝলে?

ওরা ঘাড় কাত করে চলে গেল। পুত্রক ঘুর পথে সোজা চলে গেল তার দেশে। ওর বাবা কাকারাও খুশি মনে ফিরে চললেন। বাড়ির কাছাকাছি এসে মুখ কাল করে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন। হা রে! পুত্রক। কেন যে তোকে নিয়ে গিয়েছিলাম বাবা! তোকে যে ফিরিয়ে আনতে পারব না, তা কি জানতাম বাবা!

ছুটে এলো পুত্রকের দেওয়ান। তিনি ওঁদের নিয়ে গেলেন এক মস্ত হল ঘরে। ওঁরা গিয়ে দেখে হতবাক। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে পুত্রক।

ওঁরা বললেন পুত্রক, তুমি বেঁচে!

পুত্রক বলল, হ্যাঁ! আপনার ঘাতকেরা আমায় মারতে পারে নি।

ওরা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, সে কি কথা! আমাদের ঘাতক? তোমায় মারা! এ সব কি বলছ তুমি!

পুত্রক ইঙ্গিত করতেই তিন গুপ্ত ঘাতক এসে হাজির হ'ল। তাদের দেখে মুখ শুকিয়ে গেল পুত্রকের বাবা-কাকার। পুত্রক বলল, আপনাদের মত হীন মানুষের বাঁচা উচিত নয়। একবার আমার অসহায় মাদের ফেলে পালিয়ে ছিলেন আপনারা। আমি আপনাদের খুঁজে এনে রাজ-

ঐশ্বর্য্যের মাঝে রেখেছিলাম। তাও সহ্য হয়নি আপনাদের—আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। ভাগ্যক্রমে বেঁচেছি। আপনাদের ছেড়ে দিলে আবার আমাকে হত্যার চেষ্টা করবেন। সে চেষ্টা আর যাতে করতে না পারেন, তাই আমি আপনাদের মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছি।

ওঁরা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। পুত্রক বলল, না আপনাদের প্রতি কোন মমতা নয়। নিজেকে নিরাপদ করতে আপনাদের প্রাণদণ্ড ভিন্ন পথ নেই।

পুত্রকের নির্দ্দেশে ঐ ঘাতকেরাই টেনে নিয়ে চলল ওঁদের। প্রাসাদ থেকে দূরে নিয়ে হত্যা করল তাঁদের। এ সংবাদ প্রাসাদে পোঁছালে পুত্রকের তিন মা তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, আমরা সব শুনেছি বাবা। তুমি যা করেছ তা অন্যায় নয়। তবে, ওঁদের মৃত্যুর পর আমরাও আর জীবিত থাকতে চাই না। তুমি আমাদের সহমরণের আয়োজন কর।

অনেক বোঝাল পুত্রক। কিন্তু সে তার মায়েদের নিবৃত্ত করতে পারল না। তারা পুত্রককে অনেক আশীর্বাদ করে গিয়ে বসলেন নিজ নিজ স্বামীর চিতায়। তিনটি চিতায় মোট ছ'টি দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ওদের পারলৌকিক কাজ সেরে পুত্রকও আর ঘরে থাকতে পারল না। পাগলের মত বেরিয়ে পড়ল পথে পথে।

* * *

অনেক অনেক দিন কেটে গেছে। কত দেশ, কত পাহাড়-নদী সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরে বেরিয়েছে পুত্রক। শোক কমে এসেছে তার। তবু ইচ্ছে হয় না ঘরে ফিরতে। ফিরবেই বা কার কাছে। বাবা-কাকাদের সম্পর্কে যে আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা ছিল আজীবন, আজ তা আর নেই। স্নেহের আকর ছিলেন মায়েরা—তাঁরাও গত। দাদুও হয়ত এত দিনে বেঁচে নেই। ছেলেবেলার গ্রামের ছবি মাঝে মাঝে মনকে টানে। কিন্তু সেখানে গেলে নানা স্মৃতিই তাকে আকুল করে তুলবে। তবে কি করবে পুত্রক!

একদিন বিন্ধারণ্যের গভীরে বসেছিল পুত্রক। হঠাৎ বিপুল শব্দে তার তন্ময়তা কেটে গেলো। কিসের শব্দ। প্রথমে মনে হয়েছিল ঝড়। কিন্তু ঝড় নয়। তবে ?

উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকাতেই নজরে পড়ল দুটি ষণ্ডাগুণ্ডা লোক কুস্তির প্যাঁচ কষছে। তাদের দেহর দাপটে, ছোট-খাট ঝোপ ঝাড় দলিত পিষ্ট হচ্ছে। বড় গাছে ধাক্কা লাগলে তা দুলেছে ঝড়ের দোলার মত। মরবে নাকি লোক দুটো।



পুত্রক চেঁচিয়ে বলল, মরবে নাকি। এমনভাবে মারামারি করছ কেন ?

ওরা প্যাঁচ কষতে কষতেই বল্‌ল, আমরা সম্পত্তি ভাগ করছি। যে জিতবে সে সম্পত্তি পাবে।

পুত্রক বুঝল, গায়ে জোর থাকলেও লোক দুটি বোকা। বলল, থাম। আমি তোমাদের সম্পত্তি ভাগ করে দিচ্ছি। এর চাইতে অনেক সহজে সম্পত্তি ভাগ করা যায়।

তাই নাকি। থেমে গেল দুজনেই। বলল, দিন তবে ভাগ করে। দেখি কেমন সহজে ভাগ করা যায়। আমরা সাতদিন ধরে কুস্তি করে

ভাগ করতে পারলাম না। আর উনি সহজে ভাগ করে দেবেন। দিন দেখি। তাড়া দিল ওরা।

পুত্রক মৃদু হেসে বলল, দিচ্ছি তার আগে তোমাদের পরিচয় দাও। আর কি সম্পত্তি তা দেখাও।

এ কথা শুনে একজন বলল, দাদা তুই পরিচয় বল আমি সম্পত্তি নিয়ে আসি। এই বলে সে দিল দৌড়। দাদাটি পরিচয় দিতে বসল। বলল, যুধিষ্ঠিরের নাম শুনেছেন?

পুত্রক ঘাড় কাত করল। দাদা বলল, তার রাজধানী ছিল কোথায়?

পুত্রক বলল, ইন্দ্রপ্রস্থে।

সে রাজধানী বানিয়ে ছিল কে? বলে খুব খুশিতে পা দোলাতে দোলাতে বলল, পুকুর ভেবে পা দিতে গিয়ে দুর্যোধন ঠোক্কর খেলে—পুকুর নয়—সমান মেঝে, সমান মেঝে ভেবে পা দিতে গিয়ে ডুবন জল। ঠেললে দরজা খোলে না—আঁকা। দেওয়ালে ঠেললে খুলে যায়—এমন দরজা করা মনে হয় দেওয়াল। হুঃ হুঃ বলুনতো কে বানিয়েছিল?

পুত্রক বললে, জানি। বানিয়ে ছিল ময়দানব।

দাদা বলল, হুঃ ঠিক বলেছেন। আমরা সেই ময়দানবের দুই ছেলে।

পুত্রক বিস্মিত হ'ল। অতবড় স্থপতির এই দুই মূর্খ সন্তান! হা কপাল।

এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো ভাই। একটা থালা, একটা লাঠি আর এক জোড়া খড়ম এনে নামিয়ে দিয়ে সে বলল, এই দেখুন আমাদের সম্পত্তি।

আরও অবাক হ'ল পুত্রক। এই নাকি ময়দানবের সম্পত্তি! আর এই সামান্যের জন্য এদের মরণপণ যুদ্ধ।

মনের কথা বুঝি বা বুঝতে পারল। ওরা বলল, এগুলোকে সামান্য ভাববেন না। এর প্রত্যেকটির অশেষ গুণ।

পুত্রক বলল, বটে! কার কি গুণ বল।

দাদা বলল, এ থালার কাছে যখন যা খাবার চাইবেন, তখনই তা পাবেন।

ভাই বলল, লাঠি দিয়ে মাটিতে যা লিখবেন, মাটির ওপর তাই সত্যি হয়ে উঠবে।

দাদা বলল, খড়মপায়ে যেখানে যেতে চাইবেন, সেখানে চলে যেতে পারবেন।

পুত্রক বলল, বটে! আমি যদি লাঠি দিয়ে মাটিতে লিখি যে এখানে তোমরা অনড় হয়ে থাক, তাই হবে?

দুজনেই বলল, হবে না কেন। লিখেই দেখুন,।

ভাই বলল, দাঁড়া ত' দাদা হাত ধরে।

ওরা তাড়াতাড়ি হাত ধরে দাঁড়াল। আর পুত্রক লাঠি দিয়ে লিখল, ওরা মাটির ওপর পাথর হয়ে যাক। লেখা শেষ হতে না হতে, ময়দানবের দুই ছেলে ময়দানবের পাথর কেটে তৈরী করা দুই পুতুলের মত স্থির হয়ে গেল।

মনটা একটু খারাপ হ'ল পুত্রকের। ওদের ঠকিয়ে জিনিসগুলো পেয়ে মনে মনে একটু অনুশোচনাও হল। কিন্তু এই বলে সে শান্ত করল মনটাকে যে ঐ মূর্খের হাতে থাকলে সম্পদগুলি নষ্টই হ'ত। আর সে না থামালে তো ওরা কুস্তি করেই মরত। মাঝ থেকে হারিয়ে যেত এই অমূল্য জিনিসগুলো। সে বরং ওদের কষ্টশূন্য মরণ দিয়েছে।

ভাবনা চিন্তা ঝেড়ে ফেলে, খড়মে পা লাগিয়ে উড়ে পড়ল পুত্রক। এক নগরের ওপর দিয়ে যেতে ভাল লাগায় নেমে পড়ল সেখানে। সারা দিন ঘুরে বেড়াল পুত্রক। বিকেল হতে ভাবতে লাগল কোথায় আশ্রয় নেওয়া যায়! কোন লোভীলোকের বাড়িতে আশ্রয় নিলে বিপদ হবে। অতএব কোন বণিক ধনী বা যার অনেক ছেলেমেয়ে এমন লোকের বাড়িতে আশ্রয় নেবে না বলেই স্থির করে ফেলল।

নদীর ঘাটে এক বৃদ্ধ আপনা থেকে এসেই জিজ্ঞাসা করল তাকে, কে বাবা তুমি! তোমাকে ত আগে কখনও দেখিনি। এমন রাজপুত্রের মত রূপ। তুমি এলে কোথা থেকে?

পুত্রক বলল, দেশ দেখতে এসেছি দিদিমা।

বুড়ি বলল, হরি বল! আমায় দিদিমা বললে ভাই। বেশ, বেশ।

ভালই হ'ল। আমারও তিন কুলে কেউ নেই, নাতি পেলাম। তাহ'লে এ দেশে যে কটা দিন থাকবি, আমার বাড়িতেই থাকবি ভাই!

পুত্রক বলল, তা থাকব দিদিমা। কিন্তু খাবার যোগাড়ের ভার আমার। তোমার গল্প শুনব আর দু'জন মিলে বেড়াব!

বুড়ি বলল, বেশ ত'। সে মন্দ মজা হবে না।

বুড়ির বাড়িতে আনন্দেই দিন কাটতে থাকল পুত্রকের। অনেক দিনের পর স্নেহের পরশ পেয়ে খুশিতে ভরে উঠ্‌ল তার মন।

একদিন বুড়ি বলল, হ্যাঁ ভাই! তোর বাড়ি কোথায়? বাপ-মা সকলকে কাঁদিয়ে এমনি করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন?

পুত্রক এক এক করে সব কথা বল্‌ল বুড়িকে। শুধু ময়দানবের ছেলেদের কথা বলল না। শুনতে শুনতে বুড়ির চোখ জলে ভরে এলো। পুত্রকের মাথায় হাত বুলিয়ে সে বলল, আমি বলছি তুই সুখী হবি বাবা। রাজ রাজেশ্বর হবি। বিধাতা ইচ্ছে করেই তোকে এ রাজ্যে এনেছে। এ রাজ্যের রাজকুমারীর চেয়ে আর কোন যোগ্য পাত্রী হয় না। তাকে তোর উদ্ধার করে বিয়ে করতে হবে!

পুত্রক বলল, উদ্ধার করে কেন দিদিমা!

বুড়ি বলল, বাবা, আমাদের রাজকন্যা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। নাম পাটলী। কিন্তু এমন অনামুখো রাজা যে না করে মেয়ের বিয়ের নাম, না স্বয়ম্বর সভা। মেয়ে বড় হতেই তাকে এক বিশাল প্রাসাদে বন্দী করে রেখেছে। চার দিকে অজস্র পাহারা। সাধ্য কার যে সেখানে পা বাড়ায়!

সব শুনে ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা বোধ করতে থাকল পুত্রক। সারা দিন ধরে মনে মনে নানা বুদ্ধির আনাগোনা হ'ল। রাতে গভীর হতে খড়ম পায়ে সত্যি সত্যি একেবারে রাজকন্যার প্রসাদে, তার কক্ষে চলে এলো পুত্রক।

ঘুমন্ত রাজকন্যা। সত্যিই অপরূপা। তার সঙ্গে আলাপ করতে খুবই লোভ হতে থাকল পুত্রকের। কিন্তু কি ভাবে জাগান যায়

পাটলীকে! জেগে হঠাৎ তাকে দেখে যদি চিৎকার করে ওঠে! কি করবে পুত্রক!

কি জানি, বুঝি ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে জেগে উঠল পাটলী। বলল, রাজকুমার! রাজকুমার! তুমি কি এসেছ! এসেছ আমায় উদ্ধার করতে।

পুত্রক বলল, এসেছি রাজকুমারী!

চোখ মেলল পাটলী। বলল, একি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি! কিভাবে এখানে এলে রাজকুমার!

পুত্রক বলল, আমার কাছে যাদু খড়ম আছে। তাতে করে আমি সোজা প্রাসাদে এসেছি কুমারী!

পাটলী বলল, আমার বড় ভয় করছে। যদি কেউ জেনে ফেলে তবে আমাকে যে শাস্তি দেয় দিক, কিন্তু তোমাকে যে হত্যা করবে আমার পিতা।

পুত্রক বলল, নির্ভয় হও কুমারী। আমাকে হত্যা করা অসম্ভব!

এরপর প্রতি রাতেই মায়া খড়ম পরে সেখানে আসতে থাকল পুত্রক। নিজের গল্প, দেশ-বিদেশের গল্প—গল্পে গল্পে কেটে যায় রাত। ভোরের আগেই মায়া খড়ম পড়ে চলে যায় পুত্রক।

প্রতি ভোরেই কন্যার সঙ্গে দেখা করতে আসেন রাজা। কিন্তু কন্যাকে দেখে অবাক হ'ন। সন্ধ্যার সাজ যেমন ছিল তেমন আছে, বিছানাতেও ভাঁজ পড়ে নি—সারা রাত তবে কি করেছে কন্যা?

রাজা গোপনে রাজ কন্যার ঘরে কিছু দাসীকে লুকিয়ে রাখলেন। কেউ রইল খাটের তলায়, কেউ কেদারার তলায়; কেউ বা পর্দার আড়ালে। রাজকন্যা জানলেনও না যে পুত্রকের জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছে।

সেদিন রাতে কেন জানি না গল্প জমল না। বারবার মনে হতে থাকল, কি এক না জানা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। খানিক গল্প করে চলে গেল পুত্রক। কিন্তু তার আগেই পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক দাসী পুত্রকের কাপড়ে আলতা দিয়ে রাজ অঙ্গুরীয়ের ছাপ এঁকে দিল।

পরদিন ভোর থেকে রাজার প্রহরীরা প্রত্যেকের কাপড় পরীক্ষা করে বেড়াতে থাকলো। এক সময় পুত্রকদের বাড়িতেও এলো প্রহরীরা।

নেই কোন কাপড়েই সে দাগ। প্রহরীরা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবার মুখে একটা কাচা কাপড়ের দিকে নজর গেল। হ্যাঁ! এইতো সেই দাগ! এ কাপড় কার!

পুত্রক বল্‌লে, আমার।

প্রহরীরা বলল, তবে চল রাজার কাছে।

কেন?

প্রহরী বলল, তুমিই গোপনে রাজকন্যার প্রাসাদে গিয়েছিলে। কাল দাসীরা তোমার কাপড়ে ছাপ এঁকে দিয়েছে। তাতেই তুমি ধরা পড়ে গেছ। তোমার বিচার হবে।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল বুড়ি। পুত্রক বলল, কেঁদনা দিদিমা। আমার ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। যদি প্রয়োজন হয় সংবাদ দেব। তুমি আমার ঐ লাঠি, থালা আর খড়ম নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে দিও।

রাজার লোকেরা বন্দী করে নিয়ে গেল পুত্রককে। রাজ সভায় পুত্রক স্বীকার করল যে সে রাজকন্যার প্রাসাদে গেছে। সে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চায়। রাজকন্যাও এতে অমত করবেন না। অতএব রাজা যেন তাদের বিয়ে দেন।

পুত্রকের কথায় অধিকাংশ মন্ত্রী রাজাকে পুত্রকের সঙ্গেই রাজকন্যার বিয়ে দিতে বললেন। তাঁরা পুত্রকের চেহারায় ভঙ্গিতে রাজচিহ্ন দেখলেন। বললেন এ বিবাহে মঙ্গলই হবে মহারাজ।

কিন্তু রাজা কিছুই শুনলেন না। তিনি বললেন, যে লোক গোপনে প্রাসাদে ঢুকেছে, তার ক্ষমা নেই। তার দণ্ড মৃত্যু। প্রকাশ্য রাজপথে তাকে ফাঁসি দাও।

মন্ত্রীরা দুঃখিত হলেন। দুঃখিত হলেন রাজ্যের লোক কিন্তু রাজার আদেশে রাজবাড়ির সামনেই পুত্রকের ফাঁসির আয়োজন হতে থাকল।

পুত্রক বলল, মহারাজ! মরতে আমি ভয় পাই না। তবে মরবার আগে আমার বুড়ি দিদিমাকে একবার দেখতে চাই।

রাজা বললেন, বেশ ত। তাকে দেখবে।

দিদিমাকে আনতে লোক পাঠান হ'ল। যাদু জিনিসগুলো নিয়ে

দিদিমা এলেন কাঁদতে কাঁদতে। বললে, হ্যাঁ বাবা! শেষ পর্যন্ত তোর ফাঁসি হবে! কি কুক্ষণে এদেশে এসেছিলি বাছা!

পত্রক থালা লাঠি হাতে নিয়ে খড়ম পায়ে দিয়ে বলল, আমাকে ফাঁসি দেবার সাধ্য এই নির্বোধ রাজার নেই। আসলে রাজার নিজের মরণ ঘনিয়ে এসেছে তাই এ আদেশ দিয়েছেন।

পত্রকের কথা শুনে রাজা যেন ক্ষেপে গেলেন। দৌড়ে এসে গলাটা কেটে ফেলতে পারলে যেন খুশী হন। কিন্তু ফাঁসির অপরাধীকে আর কি করবেন! শুধু বললেন, সাবধান! নির্বোধ বলবে না!

পত্রক বলল, তুমি শুধু নির্বোধ নও গদর্দভ।

এবার পত্রকের দিকে শূল হাতে দুই প্রহরী ছুটে এল। কিন্তু তার আগেই যাদু খড়ম অনেক উঁচুতে তুলে নিল পত্রককে। সেখান থেকে সে বলল, রাজকন্যাকে নিয়ে চললাম। দেখি তুমি কি করে আটকাতে পার গদর্দভ রাজা!

কি! কন্যাকে নিয়ে যাবে! সসৈন্যে প্রাসাদের দিকে ছুটলেন রাজা! কিন্তু তারা অর্ধেক পথ যাবার আগেই রাজকন্যার প্রাসাদে পৌঁছে গেল পত্রক।

রাজকন্যা তাকে দেখে চমকে উঠল। বলল, তুমি বেঁচে আছ পত্রক! তোমাকে ফাঁসি দিতে পারে নি!

অসম্ভব! আমাকে শাস্তি দেওয়া তোমার বাবার পক্ষে সম্ভব নয়! আমি ওর সব আয়োজন ব্যর্থ করে পালিয়ে এসেছি। বলে এসেছি রাজকন্যাকে নিয়ে চললাম, দেখি আপনি কি করতে পারেন।

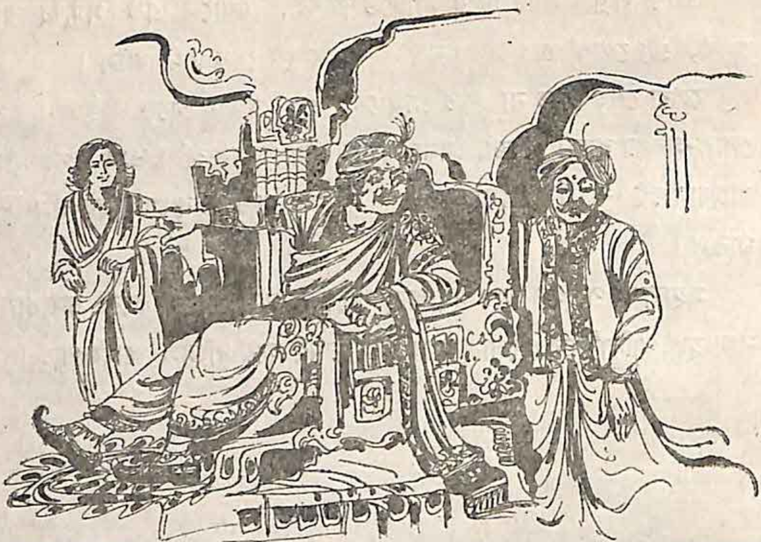
এমন সময় প্রাসাদের নিচে হৈ হৈ শোনা গেল, ওরা বুঝল যে রাজা এসে পৌঁছেছেন। আর দেরী নয়। পাটলীকে নিয়ে আকাশে উড়ল পত্রক। সৈন্যরা চেঁচিয়ে উঠল, মহারাজ! ঐ রাজকন্যাকে নিয়ে সেই দস্যু চলে যাচ্ছে। রাজা অসহায়ের মত হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

অনেক পথ ঘুরে গঙ্গাতীরে এসে থামল পত্রক। পাটলী তখন খুবই ক্লান্ত। থালাকে বলতেই এসে গেল নানা খাবার আর পানীয়। দুজনে খেয়ে দেয়ে পরিতৃপ্ত হ'ল।

এবার পুত্রক লাঠি দিয়ে মাটিতে লিখল, এখানে এক সমৃদ্ধ রাজ্য হোক, এটা হোক তার রাজধানী। আমি হই যেন তার রাজা।

লেখা শেষ হতে না হতে সেখানে এক রাজ্য গড়ে উঠ্‌ল। কত লোক-লস্কর হাতী ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত। কি সুন্দর হ'ল তার নগরগুলি। রাজধানীরই বা কি সৌন্দর্য্য। সকলে পুত্রক রাজার জয়ধ্বনি দিতে থাকল।

মহারাণী পাটলী আর মহারাজ পুত্রকের নাম একত্র করে রাজধানীর নাম হল পাটলীপুত্রক লোকমুখে সেই নামই হয়ে দাঁড়াল পাটলিপুত্র।



মহারাজ যোগানন্দের কথা

এক

এক দেশে তিন বন্ধু ছিল। তাদের নাম ব্যাড়ি, বররুচি এবং ইন্দ্র দত্ত! এরা তিন জনই নানা বিদ্যায় পণ্ডিত হবার জন্য বেরিয়েছিল যোগ্য গুরুর সন্ধানে। ভাগ্যগুণেই তারা বর্ষ নামে এক মহাপণ্ডিত গুরুর শিষ্যত্বলাভ করে। তাঁর কাছে ব্যাড়ি এবং ইন্দ্র নানা বিদ্যা শিখে আত্মতৃপ্ত হয়। কিন্তু বররুচি তাতেও খুশি না হয়ে শিবের আরাধনা করে তার বরে পাণিনির ব্যাকরণ শিখে এলেন। গুরু বর্ষ খুশি হয়ে নিজের মেয়ে উপকোশার সঙ্গে বিয়ে দিলেন বররুচির। গুরু শিষ্যেরা সবাই এতে খুশি—খুব খুশি।

বিদায়ের পালা এলো। ব্যাড়ি এবং ইন্দ্র দত্ত বর্ষকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলেন। তাদের গুরু মা বললেন, বাবা, এত বছর তোমরা আমাদের যে সেবা করেছ, যেভাবে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেছ, তাতেই তোমাদের দক্ষিণা দেয়া হয়ে গেছে।

বর্ষ বললেন, ঠিক ঠিক। তোমাদের গুরুমা ঠিকই বলেছেন তোমাদের কাছে আমাদের কোন প্রার্থনা নেই। বিশেষত তোমরা আমার জামাই-এর বন্ধু। আত্মীয়ের সমান। তোমাদের কোন দক্ষিণা দিতে হবে না। হৃষ্টচিত্তে বাড়ি যাও।

ব্যাড়ি বলল, তা কি হয় গুরুদেব। পিতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেও পুত্রকে গুরু দক্ষিণা দিতে হয়। এ হল প্রথা।

ইন্দ্রদত্ত বলল, গুরুদেব আপনি অনুগ্রহ করে মনোমত দক্ষিণা গ্রহণ না করলে তো আমাদের বিদ্যা নিষ্ফল হবে।

কি! বর্ষ হঠাৎ ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, আমি বলছি দক্ষিণা চাই না, তবু তোমরা ভাবছ, বিদ্যে হবে নিষ্ফল! বেশ তবে আমাকে দক্ষিণা দাও এক কোটি স্বর্ণ মুদ্রা!

ইন্দ্রদত্ত বা ব্যাড়ি এতে ভয় পেল না। তারা বর্ষের পায়ে প্রণাম করে বললে, আশীর্বাদ করুণ গুরুদেব, আমরা যেন যথাশীঘ্র দক্ষিণা সংগ্রহ করে আপনার কাছে ফিরে আসতে পারি।

স্থির হ'ল, পরদিন ভোরে তারা দক্ষিণা সংগ্রহে রওনা হবে। সেদিন গুরুর বাড়িতেই রয়ে গেলে তারা। বর্ষ নিজের কাজে বেরিয়ে গেলেন। তখন গুরু মা, উপকোষা, বররুচি, ইন্দ্রদত্ত ও ব্যাড়ি একত্রে পরামর্শে বসল। অনেক রকম আলোচনাতেও কোটি মুদ্রা সংগ্রহের কোন পথ পাওয়া গেল না। তখন গুরুমা বললেন, তোমরা মহারাজ নন্দের কাছে যাও। তিনি উপকোষার ধর্মভাই। তাঁর কাছে তোমাদের পরিচয় দিয়ে অর্থ চাও। তিনি অবশ্য দেবেন।

উপকোষা বলল, তা হ'লে আমিও সঙ্গে যাই।

গুরুমা তাতে আপত্তি করলেন। এতে তিনি চটে যেতে পারেন। তখন স্থির হ'ল উপকোষা নয়, তিন বন্ধুই রওনা হবে। তাতেই কাজ হবে।

পরদিন ভোরে তিন বন্ধু আশ্রম ত্যাগ করে চলল। এখন বর্ষের মনেও অনুতাপ। তিনিও অশ্রুসজল নয়নে তাদের বিদায় দিলেন। কাঁদল উপকোষা, কাঁদলেন গুরুমা। ওরা আশ্রম ছাড়িয়ে অনেক দূরে

পর্যন্ত ওদের সঙ্গে সঙ্গে এলেন। পরে ওদের আশ্রমের দিকে পাঠিয়ে তিন বন্ধু অযোধ্যায় নন্দের শিবিরের দিকে যাত্রা করল। কারণ ওরা জানতে পেরেছিল যে মহারাজ তখন রাজধানী ছেড়ে অযোধ্যায় শিবিরে বাস করছিলেন।

দিনে যাত্রা আর রাত্রে বিশ্রাম। এই ভাবে চলতে চলতে ওরা যে দিন অযোধ্যার উপকণ্ঠে এলো, সেদিনই মহারাজ নন্দ হঠাৎ মারা গেলেন। নগরবাসীরা হাহাকার করে কাঁদতে থাকল। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হ'ল রাজকার্য। বররুচি, ব্যাড়ি এবং ইন্দ্রদত্ত হতাশ হয়ে পড়ল।

এমন সময় ইন্দ্রদত্ত বলল, ভাই, আমার মাথায় এক দুষ্টুবুদ্ধি খেলছে।

ওরা বলল, বল!

ইন্দ্রদত্ত বলল, তোমরা জান না, আমার এক গুপ্তবিদ্যা জানা আছে।

কি? কি সে বিদ্যা।

ইন্দ্রদত্ত বলল, আমি যোগবলে নিজ দেহ থেকে আত্মা নিয়ে অপরের দেহে প্রবেশ করাতে পারি। আমি চাই যে সদ্যমৃত রাজার দেহে আমি প্রবেশ করি আর রাজা বেঁচে উঠুন। তখন বররুচি গিয়ে এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা চাইবে। আমি রাজার মুখে মুদ্রা দিয়ে দেবার আদেশ করব। মুদ্রা পাওয়া গেলে আমি আবার নিজ দেহে ফিরে আসব।

বররুচি বললে, বুদ্ধিটা মন্দ নয়। তবে ফিরে আসতে কোন অসুবিধা নেই তো?

ইন্দ্রদত্ত বলল, না, কোন অসুবিধা নেই। শুধু যতক্ষণ ফিরে না আসি ততক্ষণ আমার দেহ রক্ষা করতে হবে। ফিরতে দেরী হলেও দেহ পচবে না। অতএব রক্ষা করতে, কোন অসুবিধা হবে না।

ইন্দ্রদত্তের বুদ্ধিতে রাজি হ'ল সবাই। নগরীর উপকণ্ঠেই এক পোড়ো মন্দিরে গিয়ে যোগাসনে শুয়ে পড়ল ইন্দ্রদত্ত। একটু পরেই একেবারে স্থির হয়ে গেল তার দেহ। ব্যাড়ি বললে, তা হলে এতক্ষণে রাজা বেঁচে উঠেছেন।

বররুচি বলল, আমি যাই। সম্ভব হ'লে আজই দরবারে দেখা করব। নতুবা কাল।

ব্যাড়ি বল্‌ল, যাও। আমি ইন্দ্র দত্তর দেহ পাহারায় রইলাম।

*   *   *

এদিকে রাজার মৃত দেহ ঘিরে সবাই কান্নাকাটি করছেন, পুরোহিতেরা পারলৌকিক ক্রিয়াদি ও দাহের বিধি ব্যবস্থা দিচ্ছেন, মন্ত্রীরা গুপ্ত পরামর্শ করছেন কাকে কিভাবে রাজ্য দেওয়া যায়—এমন সময় হঠাৎ রাজা আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে উঠ্‌লেন। বললেন, একি তোমরা কাঁদছ কেন ?

মন্ত্রী শকটার বললেন, মহারাজ আপনি মারা গেছিলেন !

চোখ পাকিয়ে রাজা বললেন, মারা গেছিলাম ! তার মানে ? মারা গেলে কেউ কথা বলতে পারে, না কথার জবাব দিতে পারে ?

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ ! এতদিন জানতাম পারে না। এখন জানছি পারে। এই যেমন আপনি পেরেছেন !

রাজা বললেন, হেঁয়ালি রাখ। ব্যাপারটা খুলে বল।

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ ! ব্যাপার আমি নিজেই বুঝছি না। আপনি দরবারে যাবার জন্য পোশাক পরতে পরতে হঠাৎ বলে ওঠেন আমার মাথা ঘুরছে, বুকে ব্যথা !

রাজা বললেন, সঙ্গে সঙ্গে তোমরা ভাবলে আমি মারা গেছি ?

মন্ত্রী বললেন, আজ্ঞে না মহারাজ। সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে বিছানায় শুইয়ে রাজবৈদ্যকে ডাকা হ'ল। তাঁরা এসে নাড়ি টিপে বললেন, আপনি গত হয়েছেন !

রাজা বললেন, অমনি তুমি আমার শ্রাদ্ধের আয়োজনে লেগে গেলে ! ডাক রাজবৈদ্যদের।

সঙ্গে সঙ্গে রাজবৈদ্যদের ডাকতে পাঠান হ'ল। তারা কাঁপতে কাঁপতে এলেন। রাজাকে জীবিত দেখে তাদের চক্ষু ছানাবড়া। রাজা বললেন, কি বৈদ্যরাজ ! এবার নাড়ি দেখুন তো আমি জীবিত না মৃত !

ঢোক গিলে বৃদ্ধ রাজবৈদ্য বললেন, আজ্ঞে নাড়ি না টিপেও বলতে পারছি আপনি জীবিত।

রাজা বললেন, যাক্! এতক্ষণে তা হ'লে সত্যি সত্যি বাঁচা গেল। এবার তা হলে দরবারে যাওয়া যাক।

রাজবৈদ্য বললেন, মহারাজা! অভয় দেন তো বলি। আজ দরবার থাক।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

যেভাবেই হোক, আপনার ওপর দিয়ে একবার মৃত্যুর হাওয়া বয়ে গেছে। আজ বিশ্রাম নিন। বাইরে আপনার মৃত্যু সংবাদে শোক বইছিল। আপনি মৃত্যুমুক্ত জেনে তারা আনন্দ করছে—তা করতে দিন। আজ বরং আপনি প্রাসাদ গবাক্ষ থেকে কয়েকবার প্রজাদের দেখা দিন। কাল আবার দরবারে যাবেন।

ইন্দ্রদত্ত বলল, না। বিশ্রাম পরে। আগে কাজ! রাজসভায় চল শকটার।

ইন্দ্রদত্ত রাজসভায় গিয়ে বসতে না বসতেই নান্দীপাঠ এবং আশীর্বচন উচ্চারণ করতে করতে বররুচি এসে বলল, মহারাজ আমার দায় উদ্ধার করুন।

ইন্দ্রদত্ত বললে, কি তোমার দায়!

বররুচি দায় বর্ণনা করল। তা শুনে ইন্দ্রদত্ত বলল, এই ব্রাহ্মণকে এখুনি রাজকোষ থেকে এককোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দাও।

মন্ত্রী বললেন, যথা আজ্ঞা মহারাজ।

মন্ত্রী অত অর্থ দেওয়া নেওয়ার জন্য এক দিন সময় চাইলেন। যোগানন্দের দেহ থেকে ইন্দ্রদত্ত বলল, বেশ তাই হোক।

এদিকে মন্ত্রী শকটার মনে মনে ভাবলে, কোথাও কিছু গণ্ডগোল আছে। মহারাজ মরে বেঁচে উঠলেন, বিশ্রাম পরে করব বলে সভায় এলেন, সভায় আসতে না আসতে প্রার্থী এলো! মহারাজ প্রশ্ন না তুলে তাকে অত স্ববর্ণমুদ্রা দিয়ে দিলেন! নিশ্চয় যে বেঁচে উঠেছে সে আসল মহারাজ নয়। কারণ, এ তার মত বিলাসী বা কঞ্জুষ নয়। মনে

হয়, মহারাজের দেহে যে প্রবেশ করেছে সে বিদ্বান বুদ্ধিমান। একে যদি দেহে আটকে রাখা যায়, তবে মন্দ হয় না। মহারাজের পুত্রেরা যতদিন বড় না হচ্ছে, ততদিন এই মহারাজ খাড়া থাকা মন্দ নয়। তাতে রাজ্য অটুট থাকবে। আর যতক্ষণ মুদ্রাগুলি ব্রাহ্মণকে না দেওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ যে এই দেহে ঢুকেছে সে যেতে চাইবে না। অতএব আমাকে যা করতে হবে তা টাকা লেনদেনের মধ্যেই করতে হবে।

এই ভেবে সে রাজকর্মচারীদের আদেশ দিল, দেখ নগরীর কোথাও কোন প্রাণহীন দেহ আছে কি না। থাকলে তা এনে জোর করে পুড়িয়ে দাও।

রাজ কর্মচারীরা এই অদ্ভুত আদেশ পেয়ে বাড়ি বাড়ি প্রাণহীন দেহ খুঁজে বেড়াতে থাকল। অবশেষে উপনগরীর ঐ পোড়ো মন্দিরে ইন্দ্রদত্তের দেহ পেয়ে ভাবলে, আশ্চর্য মন্ত্রী শকটারের চিন্তাশক্তি! কি করে তিনি অনুমান করলেন যে এমন একটা দেহ পাওয়া যাবেই!

রাজকর্মচারীরা সে দেহ নিয়ে যেতে চাইলে ব্যাড়ি বাধা দিল। বলল, এ দেহ মৃত নয়। এ যোগাবিষ্ট হয়ে আছে। তোমরা অপেক্ষা করে দেখ, এ দেহ পচবে না এবং এক সময় এ দেহে আত্মা ফিরে আসবে।

রাজকর্মচারীদের প্রধান বললেন, এ দেহ আমরা পুড়িয়ে ফেলব। এই হ'ল মন্ত্রীর আদেশ। তুমি বাধা দিলে তোমাকে বন্দী করতে বা হত্যা করতেও পিছপা হব না।

ব্যাড়ি সাধ্যমত চেষ্টা করল, বোঝাতে পারল না। ওরা ইন্দ্রদত্তের দেহ পুড়িয়ে দিল।

পরদিন রাজসভায় গিয়ে কেঁদে পড়ল ব্যাড়ি। বলল, মহারাজ! আপনার মন্ত্রীর আদেশে আমার এক বন্ধুর যোগাবিষ্ট দেহ নিয়ে আপনার রাজকর্মচারীরা জোর করে পুড়িয়ে ফেলেছে। আপনার রাজ্যে মন্ত্রীর হঠকারিতায় ব্রহ্মহত্যা হল মহারাজ!

শুনে ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠল ইন্দ্রদত্ত। কিন্তু বাইরে তার বলবার কিছু রইল না। সে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমাকে না জানিয়ে এমন আদেশ কেন দিয়েছিলে মন্ত্রী!

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ! ইদানিং রাজ্যে বিচিত্র বিচিত্র কাণ্ড ঘটছিল। এ সব কোন না কোন তান্ত্রিকের কাজ। তার শক্তি নষ্ট করতে এ আদেশ দিয়েছিলাম মহারাজ।

রাজা বলল, কিন্তু তোমাদের হঠকারিতায় ব্রহ্মহত্যা হ'ল।

মন্ত্রী বল্লেন, মহারাজ প্রয়োজনে এজন্য শাস্ত্র-নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করা যাবে। এতে কোন ক্ষতি হবে না। আপনি ইচ্ছা করলে এই ব্রাহ্মণকে এজন্য ক্ষতিপূরণও দিতে পারেন।

মন্ত্রী শকটার ইন্দ্রদত্তের দেহ দাহ করার ব্যাপারটাকে আদৌ গুরুত্ব দিল না। সান্ত্বনা দেবার ছলে ব্যাড়ির কাছে এসে রাজা বল্ল, ব্যাড়ি! আমাকে আমৃত্যু এই শূদ্র রাজার দেহেই থাকতে হবে!

ব্যাড়ি বল্ল, সাবধান ভাই! শকটারের কাছে তুমি ধরা পড়ে গেছ। আমার মনে হয় তার বুদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তোমাকে রক্ষা করবার মত বুদ্ধি এক বররুচির আছে। তুমি তাকে তোমার মন্ত্রীপদে বরণ করে নাও।

ব্যাড়ির বুদ্ধি ইন্দ্রদত্তর ভাল লাগল। সে বলল, ঠিক আছে তোমরা গুরু দক্ষিণা দিয়ে ফিরে এসো! তারপর যা করবার করা যাবে।

* * *

ব্যাড়ি আর বররুচি গুরু দক্ষিণা দিয়ে ফিরে এলো। যোগানন্দ-বেশী ইন্দ্রদত্ত তখন পাটলিপুত্রে ফিরে এসেছে। ওরা এসে দুঃসংবাদ শুনল। ক্রুদ্ধ ইন্দ্রদত্ত একশত পুত্র সহ শাকটারকে বন্দী করেছে। তাদের রেখেছে মাটির তলার একটি ঘরে। তাদের বরাদ্দ হয়েছে প্রতিদিন মাত্র এক সরা করে ভাত, এক ভাঁড় করে জল।

ওরা পাটলিপুত্রে আসতেই যোগানন্দ বররুচিকে মন্ত্রী পদে বরণ করল। ব্যাড়ি কিছুতেই কোন পদ গ্রহণ করল না। সে বলল, না মহারাজ আমি ইহলোকের সুখভোগ চাই না। আমি কোন তীর্থে গিয়ে তপস্যা করব।

কিছুতেই ব্যাড়িকে আটকানো গেল না। বররুচি মন্ত্রী হয়ে উপকোষাকে আনিয়ে রাজধানীতেই বাস করতে থাকল। সে প্রতিমুহূর্ত্তে

ভাবতে থাকলে কিভাবে শকটারকে মুক্ত করিয়ে এনে তার প্রতি অবিচারের প্রতিকার করা যায়! আর যোগানন্দ বেশী ইন্দ্রদত্ত মনের আক্রোশে ভাবল, আমি এত কষ্টে অর্জিত বিদ্যা এবং ব্রাহ্মণত্ব যদি হারালাম, তবে আর কিসের সংযম! সে দিনরাত বিলাস ব্যসনে মত্ত হয়ে উঠল।

দুই

বন্দী হয়ে অন্য কেউ হলে হয়ত বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলত' কিন্তু শকটার একতিলও বিচার শক্তি হারালেন না। তিনি পুত্রদের ডেকে বললেন, দেখ বাবারা! বিপদকালে যারা স্থির ভাবে বিচার করে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করতে পারে, তারাই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হয় তারাই টিকে থাকে! এখন আমাদের সেই বিপদকাল—সংকটের সময়।

ছেলেরা বলল, বাবা! আপনি পণ্ডিত, আপনি অভিজ্ঞ। আপনি বহুদর্শী। সম্রাট আমাদের অকারণে বন্দী করেছেন। এমন ব্যবস্থা করেছেন, যাতে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য! এর থেকে পরিত্রাণের উপায় বলুন। আমরা নত মস্তকে আপনার নির্দেশ মানব।

বড় ছেলে বলল, শুধু পরিত্রাণ চাই না বাবা! প্রতিশোধও চাই। মহারাজ যোগানন্দকে এ অন্যায়ের শোধ দিতে হবে।

শকটার বললেন, হ্যাঁ প্রতিশোধও চাই। কিন্তু কিভাবে?

ছেলেরা বলল, আপনি বলুন।

শকটার বললেন, দেখ, রাজা আমাদের যা খাদ্য এবং পানীয় দিয়েছেন, তাতে একশ' একজনের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। তা মাত্র এক জনের খাদ্য ও পানীয়।

একটু থামলেন শকটার। তার পর স্বর উঁচু করে বললেন, আমরা যদি নিজেদের মধ্যে মারামারি করি তবে কেউ বাঁচব না। এখন আমাদের স্থির করতে হবে, আমরা এক শ' জন মরে, একজনকে বাঁচিয়ে রাখব। যে আমাদের মৃত্যুর শোধ নেবে। কে হবে সেই ব্যক্তি।

সকলে বলল, আমাদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি আপনি। আমরা মরি ক্ষতি নেই। আপনি বেঁচে থাকুন পিতা। আপনিই এ অবিচারের শোধ নিতে পারবেন।

এরপর সেই এক শ' পুত্র তিল তিল ক'রে মৃত্যু বরণ করল আর শাকটার তাদের মৃত্যুর মুখে অন্ন এবং পানীয় গ্রহণ করে বেঁচে রইলেন। প্রতি পুত্র মরবার আগে একবার করে বলে গেল, বাবা, প্রতিশোধ নিও।

শকটার বললেন, নেব।

এমনি করে মৃতের গলিত পূতিগন্ধে আর কঙ্কালের মধ্যে পিশাচের মত বেচে রইলেন শকটার। তাঁর শীর্ণ দেহে চোখ দুটি আগুনের মত জ্বলতে জ্বলতে শুধু একটি কথা বলতে থাকল, 'প্রতিশোধ'।

* * *

এদিকে ইন্দ্রদত্ত ক্রমেই উচ্ছৃংখল হয়ে উঠল। তাকে সামলাতে বররুচি হিমশিম। তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কিন্তু বন্ধুকে ত্যাগ করতেও মন সরে না। অতএব বুদ্ধি করে একদিন যোগানন্দবেশী ইন্দ্রদত্তকে বলল, অভিজ্ঞ মন্ত্রী শকটার না থাকায় রাজ্যের বড়ই ক্ষতি হচ্ছে। আমি রাজ্যের সব জানিও না। সে সঙ্গে থাকলে সুবিধা হ'ত।

ইন্দ্রদত্ত বলল, লোকটাই তো আমার এত দুর্দশার মূল।

বররুচি বলল, দুর্দশা বলছ কেন! তুমি তো রাজা হওয়ার সুখ চুটিয়ে ভোগ করছে। অথচ যে লোকটা তোমাকে এত সুখের স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিল, তাকে তুমি অন্ধ কারাগারে বন্দী করে রাখলে! তার পুত্রদেরও ঠেলে দিলে মৃত্যুর মুখে।

মনটা সেদিন ইন্দ্রদত্তর ভালই ছিল। সে বলল, হুঁ, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেছিল। রাগের মাথায় আদেশ দিয়েছিলাম। এখন তুমি কি চাও।

বররুচি বলল, আমি চাই তাকে মুক্ত করে এনে আবার মন্ত্রীপদে বহাল করতে।

ইন্দ্রদত্ত বলল, লোকটি ধূর্ত্ত। পারবে তাকে বশে রাখতে!

বররুচি বলল, আমার শক্তিতে তোমার সন্দেহ থাকলে তাকে মুক্ত করো না।

ইন্দ্রদত্ত হাসল। বলল, এত অল্পে রাগ কর কেন? তোমার মতেই মত দিলাম।

* * *

রাজার মত পেয়ে বররুচি নিজে গিয়ে মুক্ত করে আনল শকটারকে। রাজা সমাদর করে তাকে পুনরায় মন্ত্রী পদে বরণ করল। শকটার মুখে বিন্দুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না। তিনি বুঝলেন, অসাধারণ কুটবুদ্ধি বররুচি থাকতে রাজার ক্ষতি করা অসম্ভব ব্যাপার! তিনি যেন সব ভুলে গেছেন এমন ভাব দেখিয়ে বররুচির সঙ্গে মিলে কাজ করতে থাকলেন।

এ দিকে রাজা যোগানন্দের খামখেয়ালীপণা বেড়েই চলল। তাকে সামলান বররুচির পক্ষেও অসম্ভব হয়ে পড়ল। আর এমন সব কাজে বাধা দেওয়ায় ইন্দ্রদত্ত বররুচির ওপরেও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তার মনে হ'ল লাই পেয়ে বররুচি বড়ই মাথায় উঠেছে। তার সত্যি পরিচয় জানে বলেই বররুচির এত সাহস। ভাবতেই মাথা গরম হয়ে উঠল ইন্দ্রদত্তের। সে শকটারকে ডেকে পাঠাল। বলল, আমি চাই, আজ রাতের মধ্যে বররুচিকে যেন হত্যা করা হয়। প্রজারা যেন এ বিষয়ে কিছুই জানতে না পারে।

শকটার বললেন, তাই হবে মহারাজ!

বললেন বটে তাই হবে, কিন্তু শকটার মনে মনে অন্য কথা ভাবলেন। তিনি কিছুতেই বররুচিকে হত্যা করতে দিতে পারেন না। এই ব্যক্তির সাহায্য না পেলে তিনি কিছুতেই কারাগার থেকে মুক্ত হতে পারতেন না। তিনি কৃতজ্ঞ।

অতএব তিনি গিয়ে বররুচিকে রাজাদেশের কথা খুলে বললেন। এবং বললেন, আপনি আমার বাড়িতেই আত্মগোপন করে থাকুন। আমি শাস্তিযোগ্য কাউকে হত্যা করিয়ে রাজাকে জানাব আপনি নিহত হয়েছেন।

অচিরেই রাজার অনুতাপ হবে। তিনি আপনার কথা বলবেন। তখন আপনি আবার আত্মপ্রকাশ করবেন।

বররুচি মেনে নিলেন তার কথা। বললেন, আপনার নীতিনৈপুণ্য আমাকে প্রীত করল। বুঝলাম যে আপনিই মন্ত্রী হবার যোগ্য মানুষ। তবে আপনাকে আরও একটা কথা জানিয়ে রাখি। আপনি চেষ্টা করলেও আমাকে হত্যা করতে পারতেন না।

কেন?

আমি এক সময় তপস্যা দ্বারা এমন শক্তি অর্জন করেছি, যার ফলে এক শক্তিধর অলক্ষ্যে আমাকে রক্ষা করে এবং প্রয়োজন মত নানা রহস্যের কথা জানিয়ে যায়।

কি রকম?

যেমন, আপনি মনে মনে আজও যোগানন্দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চান, তা আমি জানি। সময় হলে আমি যোগানন্দকে ছেড়ে যাব। তখন আপনি প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পাবেন। এখনও সময় আসেনি।

শকটার বররুচিকে প্রণাম করলেন। বললেন, আপনি যাঁকে বন্ধুভাবে রক্ষা করেন, তার ক্ষতি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বররুচি শকটারের বাড়িতে রয়ে গেলেন। কিন্তু এভাবে দিনরাত লুকিয়ে বসে থাকা তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। সে বারংবার শকটারকে বলতে থাকল, আর কতকাল এমন জীবনমৃত হয়ে থাকব!

শকটার বলল, অধৈর্য্য হবেন না। সুযোগ আসবেই।

সত্যিই সুযোগ এলো। অভাবিতভাবে।

একদিন মহারাজ যোগানন্দের এক ছেলে, হিরণ্যগুপ্ত শিকার করতে গেল বনে কিন্তু ফিরে এলো বদ্ধ উন্মাদ হয়ে। ছেলের এ অবস্থা দেখে যোগানন্দবেশী ইন্দ্রদত্ত মনে মনে খুবই বিচলিত হ'ল। রাজ্যের কোন বৈদ্যই রাজপুত্রকে সুস্থ করতে পারল না। তখন হঠাৎ ক্ষোভে ইন্দ্রদত্ত বললে, হায়! এ সময় যদি বররুচি থাকত! সে সুস্থ করতে পারত আমার ছেলেকে। কি দুর্বুদ্ধিতেই যে তাকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম।

শকটার বললেন, মহারাজ! তখন আপনার কথা না শুনে যদি বাঁচিয়ে রাখতাম তাঁকে!

ইন্দ্রদত্ত বললে, তা হলে আজ তোমাকে মহা পুরস্কার দিতাম! তুমি কি অত বুদ্ধিমান!

শাকটার বললেন, মহারাজ কম বুদ্ধিই ভাল। এই কম বুদ্ধিতেই বুঝেছিলাম যে আপনি মুখে যে আদেশ দিয়েছিলেন, তা আপনার মনের আদেশ নয়। আমি বররুচিদেবকে হত্যা করি নি।

ইন্দ্রদত্ত শকটারের হাত চেপে ধরলে। বললে, এখুনি নিয়ে এসো তাকে।

বররুচিকে নিয়ে এলেন শকটার। ইন্দ্রদত্ত বররুচির কাছে ক্ষমা চাইল। তারপর বলল, আমার ছেলেকে তুমি ভাল করে দিতে পার বররুচি!

বররুচি বলল, পারি। আমার রক্ষক শক্তিধর আমাকে জানিয়েছে যে, হিরণ্যগুপ্ত তার বন্ধুদের সঙ্গে বিশবসঘাতকতা করায় বন্ধুর শাপে তার এ অবস্থা হয়েছে। দেখুন, আমি এই কারণ জানানতেই হিরণ্যগুপ্ত অর্দ্ধেক রোগমুক্ত হয়েছে। এবার ও নিজে ওর কৃতঘ্নতার কাহিনী বললে পূর্ণমুক্ত হবে।

বররুচির কথা শেষ হতে না হতে হিরণ্যগুপ্ত বলল, হ্যাঁ মনে পড়েছে। সত্যিই আমি অকৃতজ্ঞের মত কাজ করেছিলাম। শুনুন আমার সেই কাহিনী :—

শিকার করতে গিয়ে সন্ধ্যার মুখে আমি বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসতে থাকল আমি নিরুপায় হয়ে এক গাছে উঠে বসে রইলাম। খানিক পরে নিচে সিংহের গর্জন শোনা গেল। দেখলাম, তার তাড়া খেয়ে একটা ভালুকও ওপরে উঠে এসেছে। আমার তখন উভয়সঙ্কট। কি করি! নীচে সিংহ, গাছে ভালুক! এমন সময় ভালুকটি বলল, ভয় পেও না। আমরা এখন দুজনেই দুজনের বন্ধু। আমরা দুজনে মিলে ঐ সিংহটাকে হতাশ করব।

এই বলে সেই ভালুকটি আমার কাছাকাছি এসে বসল। সিংহটি নীচে দাঁড়িয়ে তর্জন গর্জন করেই চলল। সারাদিনের ক্লান্তিতে তখন আমার চোখ জুড়ে ঘুম নামছে। ভালুক বলল, তুমি নিশ্চিন্তে আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাও। আমি তোমায় রক্ষা করব মাঝ রাতে ডেকে দেব তোমায়। তখন তুমি জেগে আমায় রক্ষা করবে। আমি ঘুমাব। আমি ভালুকের কথায় রাজি হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাঝ রাতে আমাকে ভালুকবন্ধু ডেকে দিল। বলল, এবার তুমি জাগবে। আমি ঘুমাব। বলে শুতে শুতে ভালুক আবার বলল, সাবধান বন্ধু। সিংহ খুব দুষ্টু। তুমি ঘুমোতেই ও আমাকে বলেছিল, দাও না মানুষটাকে ফেলে। মানুষকে কি বিশ্বাস করতে আছে! আজ বেঁচে গেলে কালই ও তীর মেরে মারবে তোকে। আমি বললাম, দূর হ' শয়তান। তোর প্রলোভনে কি আমি বন্ধুকে হত্যা করব! দেখো, আমি ঘুমালে, সিংহ তোমাকেও প্রলুব্ধ করবে।

সত্যিই তাই। ভালুক ঘুমাতে না ঘুমাতে সিংহ আমাকে বলল, ও রাজপুত্তর! ভালুকটাকে বাঁচিয়ে তোমার কি লাভ? ও তো কাল সকলেই তোমার রক্ত মাংস খাবে। আমি আছি দেখে তোমাকে বন্ধু বলছে।

আমার কেমন মনে হতে লাগল সিংহ যা বলছে, তাত' সত্যি। এই না ভেবে দিলাম ঘুমন্ত ভালুককে এক ঠেলা দিয়ে ফেলে। ভালুক পড়তে পড়তে আর একটা ডাল চেপে ধরল। তারপর আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলল, বিশ্বাসঘাতক! বন্ধুকে মারবার চেষ্টা! এখন থেকে থাক উন্মাদ হয়ে। কোন পণ্ডিত সকলকে এর কারণ বললে তুই অর্দ্ধ উন্মাদ মুক্ত হবি, আর বাকীটা মুক্ত হবি নিজ মুখে নিজের এই অকৃতজ্ঞতার গল্প সকলকে বললে।

গল্প বলা শেষ হ'লে হিরণ্য গুপ্ত সুস্থ হয়ে উঠল। যোগানন্দ

বররুচিকে অনেক সমাদর করলে। কিন্তু সে বাড়ী গিয়ে যা শুনলে তাতে বন্ধুর প্রতি বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে গেল। বররুচির মৃত্যু সংবাদ শুনে উপকোষা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। এরপর বররুচিরও আর সংসারে থাকতে মন চাইল না। সে মন্ত্রীত্বেরও প্রলোভন উপেক্ষা করে চলে গেল বনে। তপস্যায় বাকী জীবন কাটিয়ে দেবে বলে।

তিন

যোগানন্দের পাশে এবার কেউ নেই। বররুচি একদিন বলেছিলেন, তিনি চলে গেলে, শাকটারের সুযোগ আসবে যোগানন্দের ওপর প্রতিশোধ নেবার। আজ তবে এসেছে সেই প্রতিশোধ নেবার দিন! কিন্তু কিভাবে! সেটাই ভাবছেন শাকটার।

আসল যোগানন্দের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত অনেক দিন রাজ্য ছাড়া। কে জানে তার সংবাদ! সেই তো রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী। তারই হাতে



তুলে দিতে হবে রাজ্য। এই সব ভাবতে ভাবতেই একদিন পথে চলছিলেন শকটার। হঠাৎ দেখলেন এক বিকট দর্শন ব্রাহ্মণ এক

জায়গাকার মাটি খুঁড়ছেন। শকটাল দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণ কি যেন বিড়বিড় করছে। তাঁর কৌতূহল জন্মাল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মাটি খুঁড়ছেন কেন ব্রাহ্মণ!

লোকটি মাথা তুলে তাকাল। বলল, খুঁড়ব না! পুরো অঞ্চল আমি খুঁড়ে ফেলব। এখানকার কুশ আমার পায়ে বিদ্ধ হয়েছে। আমি এখান থেকে কুশের সব মূল উৎপাটন করব। কুশশূন্য করব এ অঞ্চল।

শকটার ভাবলেন, লোকটা যেমন ক্রুর তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমন লোক না হইলে যোগানন্দকে হত্যা করা যাবে না। এই ভেবে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নাম কি ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণ বললেন, আমার নাম চাণক্য।

আরও দু একটি প্রশ্নে শকটার বুঝলেন, চাণক্য শুধু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বা ক্রুরই নয়, পণ্ডিতও বটে। যোগ্য মানুষ। তিনি বললেন, পণ্ডিত। আমি রাজমন্ত্রী। আগামী শুক্লা ত্রয়োদশীতে মহারাজ নন্দের বাড়িতে এক শ্রাদ্ধের আয়োজন আছে। আমি তাতে আপনাকে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।

চাণক্য রাজী হলেন। শকটার তাকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। সেখানেই থাকলেন চাণক্য। এবার শকটার সুবন্ধু নামে যে ব্রাহ্মণ প্রতিবার প্রধান অতিথি হয়ে থাকে তাকে আনতে লোক পাঠালেন। আবার শ্রাদ্ধের দিন, ভোর হতে না হতে চাণক্যকে নিয়ে গেলেন যোগানন্দর বাড়িতে। বললেন, মহারাজ! আমি এক সুপণ্ডিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সদ্-ব্রাহ্মণকে সঙ্গে এনেছি। আপনি তাঁকে প্রধান অতিথি পদে বরণ করুন।

নন্দ বলল, আপনি যখন এনেছেন, তখন বরণ করুন তাকে।

শকটার দ্রুত চাণক্যকে সে পদে বরণ করলেন। চাণক্য গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। শকটাল অন্য কাজ দেখবার ছল করে সরে গেলেন।

ইতঃমধ্যে সুবন্ধু এসে পৌঁছাল। সে দাবী করল যে, এ পদ সে দীর্ঘকাল পেয়ে আসছে। ঐ পদ তারই প্রাপ্য। সে উপস্থিত থাকতে ঐ পদে আর কেউ বসতে পারে না।

চাণক্য বললেন, পূর্ব বৎসর কি হয়েছে তা জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে পূর্ণ মর্যাদায় যে পদে আমাকে বসান হয়েছে, তা আমি ছাড়ব কেন ?

সভাজনেরা চাণক্যকেই সমর্থন করলেন। সুবন্ধু তখন সোজা গিয়ে যোগানন্দকে তার আবেদন জানাল। ইন্দ্রদত্ত ব্যাপার কিছুই জানত না। মন্ত্রী শকটার তাকে সব খুলে বলেন নি। সে ইতস্তত করতে থাকল। ইতঃমধ্যে হিরণ্যদত্ত এসে বলল, বাবা, সুবন্ধু উপস্থিত থাকতে আর কেউ প্রধান অতিথি হতে পারে না, এ কথা ঠিক।

ইন্দ্রদত্ত তখন বললে, তাহলে তুমি গিয়ে সেই ব্রাহ্মণকে বিদায় করে, সুবন্ধুকে ঐ পদে বসাও।

ইন্দ্রদত্ত ভালই বলেছিলেন। চাণক্যকে ভদ্রভাবে বুঝিয়েও বিদায় করা যেত। কিন্তু সুবন্ধুর প্ররোচনায় হিরণ্যগুপ্ত সেখানে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন, ঐ চণ্ডালটাকে প্রধান অতিথির আসনে কে বসিয়েছে!

চাণক্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, আমি চণ্ডাল! রাজপুত্র হিতাহিত জ্ঞান হারিও না। আমি এখানে স্বেচ্ছায় আসি নি। আমাকে আহ্বান করে আনা হয়েছে। আমাকে প্রধান অতিথির পদ দেওয়া হয়েছে। এখন আমাকে অপমান করলে দেবতাদেরও অপমান করা হবে। তোমার যজ্ঞ ও অনুষ্ঠান ব্যর্থ হবে।

হিরণ্যগুপ্ত গিয়ে তার শিখা টেনে আসন থেকে নামিয়ে বলল, যাও যাও! বাইরে গিয়ে আস্ফালন কর গিয়ে।

ক্রোধে চাণক্যের চোখ দুটি দুপুরের সূর্যের মত জ্বলে উঠল। তিনি শিখায় হাত দিয়ে বললেন, কি! সূর্যাস্তের আগেই আমার শিখা-বন্ধন খুলে দিলি! বেশ! তবে পামর, আমি অভিসম্পাত দিচ্ছি, ব্যর্থ হবে তোদের এ যজ্ঞ-অনুষ্ঠান। আর এক সপ্তাহের মধ্যে তোদের রাজা এবং রাজ্য উচ্ছন্নে যাবে।

রাজগৃহ থেকে বেরিয়ে সোজা শকটারের বাড়ি গেলেন চাণক্য। যেখানে সাক্ষাৎ হ'ল চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে। শকটারই তাকে ডেকে এনেছেন

নিজের বাড়িতে। চাণক্যকে দেখে চন্দ্রগুপ্ত প্রণত হয়ে বললেন, গুরুদেব! আপনি এখানে!

শকটার বিস্মিত হ'লেন। বললেন, এঁকে তুমি চেন চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, ইনি আমাকে বহু শাস্ত্রবিদ্ করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন রাজনীতি। আমি ওঁর আদেশের অপেক্ষায় আছি। আদেশ পেলেই প্রাসাদ আক্রমণ করব।

চাণক্য বললেন, দিন আগত। যোগানন্দের দেহে এক ভিন্ন আত্মা বাস করছে। আমি তান্ত্রিক ক্রিয়ায় তার সর্বনাশ করব। তুমি আগামী পরশু ভোরে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করবে। বলে চাণক্য গিয়ে বসলেন তান্ত্রিক ক্রিয়ায়।

পুরো দিনটা কেটে গেল। আরও একদিন একরাত কাটতে রাজ-প্রাসাদে আর্ত্তনাদ করে পড়ে গেলেন যোগানন্দ। আগের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিন থেকেই তার শরীর মন খারাপ। অনুষ্ঠানে হবি জ্বলল না। পুরোহিতেরা মন্ত্র ভুলতে থাকলেন। অতিথিরা ক্রমাগত বিবাদ করে চলল। বিশৃঙ্খলার একশেষ। সকলেই বলতে থাকলেন, ঐ তেজস্বী ব্রাহ্মণের শাপে আজকের অনুষ্ঠান ব্যর্থ হ'ল। যোগানন্দ তখন থেকেই বুঝলেন যে তাহলে আর এক সপ্তাহও নেই তঁার আয়ু।

যতই ভোর হতে থাকল, ততই তার যন্ত্রণা বাড়তে থাকল। রাজ-বৈদ্যেরা কোন কষ্টই লাঘব করতে পারলেন না। ভোরের আলো প্রাসাদে ছাড়িয়ে পড়তে না পড়তে হিরণ্যগুপ্ত এসে জানাল, সর্বনাশ হয়েছে মহারাজা। চন্দ্রগুপ্ত রাজধানী ঘিরে ফেলেছে। সেনাপতিরা সসৈন্যে তার দিকে যোগ দিয়েছে। প্রহরীরা সব দরজা খুলে দিয়েছে। তার সৈন্যেরা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

যোগানন্দ বলল, তাকে বাধা দিও না। তোমরা ভিন্ন গুপ্তপথে পালাও। বলা শেষ হতে না হতেই যন্ত্রণায় চিৎকার উঠলেন যোগানন্দ। তারপরেই তার দেহ স্থির হয়ে গেলে। হিরণ্যগুপ্ত বাবা বলে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু বাবার দেহ সে স্পর্শ করতে পারল না। তার আগেই চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যেরা তাকে বন্দী করল। শুধু তাকে নয়,

যোগানন্দের সব ছেলেই বন্দী হলেন। শকটালের পরামর্শে তাদেরও সেই কারাগারে রাখা হ'ল। দেওয়া হ'ল এক থালা ভাত আর এক কলসি জল। ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে প্রতিদিনই খাবার জল নষ্ট করে অল্প কয়েক দিনেই মারা গেল। যোগানন্দের দেহ সৈন্যেরা দাহ করল।

চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসলেন। শকটালের সব ইচ্ছা পূর্ণ হল। এবার তিনিও রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সংসার ত্যাগ করে তপস্যার জন্য বনে চলে গেলেন।



সহস্রানীক মৃগবতীর কথা

অনেক অনেক কাল আগে ভারতবর্ষে বৎস নামে এক রাজ্য ছিল। রাজধানীর নাম ছিল কৌশাম্বী। যেমন সুন্দর দেশ, তেমন তার রাজধানী। এত ঐশ্বর্য তার যে লোকে বলত লক্ষ্মীর আবাস। যেন দেবতারা স্বর্গের আদর্শে আর এক স্বর্গ গড়েছেন মর্ত্যে। এ যেন পৃথিবী দেবীর কানের দুল—কর্ণভূষণ।

বৎস রাজ্যের রাজা ছিলেন শতানীক। সেই যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হ'ল—কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ, শতানীক ছিলেন সেই পাণ্ডববংশের সন্তান। তোমরা জান, কুরুবংশে বাতি দিতে কেউ ছিল না। দ্রৌপদীর পঞ্চ-পুত্রকেও হত্যা করেছিল অশ্বত্থামা। ফলে পাণ্ডব বংশেও কেউ ছিল না। তখন হিসেব করে দেখা গেল, আছেন একজন। তিনি তখনও ভূমিষ্ঠ হননি। মাতৃগর্ভে। তিনি হলেন অভিমন্যুর পুত্র—পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিতের পুত্রের নাম জনমেজয়। জনমেজয়ের পৌত্র ছিলেন শতানীক।

যৌবন অতিক্রান্ত হলেও শতানীকের কোন সন্তান জন্মাল না। বড়ই দুঃখ। এত খ্যাত বংশের শেষে কি অবলুপ্তি ঘটবে!

একদিন মৃগয়ায় গিয়ে শাণ্ডিল্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল রাজার। তিনি রাজার মন-দুঃখের কথা শুনালেন। শুনে তাকে কি সব দিয়ে একটা পিষ্টক তৈরী করে দিলেন। বললেন, মহারাজ! রাণী বিষ্ণুমতীকে এই পিষ্টক দেবেন, তা হ'লেই আপনার মনস্কাম পূর্ণ হবে।

মুনির কথা ফলল। যথাসময়ের শতানীকের এক পুত্র জন্মাল। তার নাম রাখা হ'ল সহস্রানীক। বিদ্যায় বুদ্ধিতে, শৌর্য্যে এবং বিনয়ে বাবারই যোগ্য হয়ে উঠল সে। আনন্দে শতানীক তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

এই সময়েই স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ শুরু হ'ল। ইন্দ্র শতানীককে ডেকে পাঠালেন তাঁর হয়ে যুদ্ধ করবার জন্য। তার সারথি মাতলি এলো রাজাকে নিয়ে যেতে। শতানীক তাঁর মন্ত্রী যোগান্ধর এবং সেনাপতি সুপ্রতীককে ডেকে রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। তারপর নিজে চলে গেলেন স্বর্গের যুদ্ধে যোগ দিতে।

যুদ্ধে দেবতাদের জয় হ'ল। শতানীকের বীরত্বের জয়জয়াকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে রাজা নিজে নিহত হ'লেন। দেবতারা বিজয়মাল্যে সাজিয়ে শতানীকের মৃতদেহ ফিরিয়ে আনলেন কৌশাম্বীতে। শোকের মধ্যেও একটা গর্ব এবং আনন্দের সুর জেগে রইল। পরম সমারোহে রাজাকে দাহ করা হ'ল। রাণী বিষ্ণুমতী সেই চিতায় আত্মাহুতি দিলেন সহমরণে। প্রজারা সেই পবিত্র চিতার ছাই স্মৃতি হিসাবে গৃহে গৃহে রেখে দিল।

কৌশম্বীতে এই পালা শেষ হতে না হ'তে ইন্দ্র নিমন্ত্রণ পাঠালেন। স্বর্গে বিজয়-উৎসব শুরু হয়েছে। শতানীকের স্থানে উপস্থিত থাকবেন তাঁর যোগ্যপুত্র সহস্রানীক। পিতার বীরত্বের পুরস্কার এবং দেবতাদের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করবেন পুত্র।

মন্ত্রী যোগান্ধর এবং সেনাপতি সুপ্রতীক সহস্রানীককে যথাসম্ভব সুন্দর সাজসজ্জায় সজ্জিত করে উৎসবে যোগ দিতে পাঠালেন। ঐ উৎসব দেখে যুবরাজের পিতামাতার বিয়োগ ব্যথা কমবে।

নন্দনকাননে স্বর্গের উৎসব। সৌন্দর্য্য আর বিলাসের সীমা

নেই। তার ওপরে এই বিজয়ের সেরা বীর শতানীকের পুত্র বলে সহস্রানীকের সমাদরেরও সীমা রইল না। প্রতিটি দেবতা সস্ত্রীক এসে উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করে যেতে থাকলেন তাকে। প্রতিটি আনন্দক্ষেত্রে তাকেই আগে ভোগ করতে পাঠাতে থাকলেন দেবতারা। যে কোন যজ্ঞে যেমন প্রথম ভাগ অগ্নির—এখানেও যেন, প্রথম আস্বাদন সহস্রানীকের।

এমনিভাবে সহস্রানীক যখন আনন্দে মেতে উঠেছেন, সেই সময় ইন্দ্র একদিন নিভৃতে ডাকলেন তাকে। বললেন, শোন সহস্রানীক। তুমি আমার বন্ধু-পুত্র। তোমার পিতা আমাদের বিজয়ের প্রধান কারণ। শুধু এ কারণেই তোমাকে এ উৎসবে ডাকিনি। আমি তোমাকে তোমার পূর্বজন্মের কথা শোনাতে চাই। এ কথা জানা তোমার প্রয়োজন।

সহস্রানীক বিনীতভাবে বললেন, বলুন পিতৃব্য।

ইন্দ্র বললেন, অনেক অনেকদিন আগে আমি একবার ব্রহ্মার দরবারে গিয়েছিলাম, তখন সেখানে উপস্থিত ছিল বিধুমা নামে এক অপ্সর আর অলম্বুশা নামে এক অপ্সরী। আমরা হঠাৎ দেখলাম ওরা দুজন একে অন্যেকে কি ইঙ্গিত করছে। ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। না-জানি কি হয়। স্বয়ং ব্রহ্মার ক্রোধ সহ্য করা'ত সহজ নয়। তাই তাড়াতাড়ি আমি তাদের অভিশাপ দিলাম, তোমরা মর্ত্তে গিয়ে মানুষ হয়ে জন্মাও। সেখানে তোমরা হবে স্বামী-স্ত্রী। ব্রহ্মার সম্মুখে ইঙ্গিত করার সেই হবে যোগ্য শাস্তি। দেখলাম, আমার অভিশাপের কথা শুনে ব্রহ্মার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। বুঝলাম বিধুমা ও অলম্বুশার ফাঁড়া অল্পে কাটল।

ইন্দ্র থামলেন। সহস্রানীক বললেন, এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোথায়!

ইন্দ্র বললেন, মর্ত্ত জন্মে চন্দ্রবংশীয় পরমধার্মিক রাজা শতানীকের পুত্র রূপে জন্মেছে বিধুমা!

সহস্রানীক বললেন, তবে আমিই শাপগ্রস্ত বিধুমা! দেবী অলম্বুশা কোথায়?

ইন্দ্র বললেন, তিনি জন্মেছেন অযোধ্যায় রাজা কৃতবর্মার কন্যারূপে। রাণী কলাবতী তাঁর নাম রেখেছেন মৃগাবতী। মৃগাবতী শুধু রূপে অতুলনীয়া নন। তিনি নানা গুণে গুণবতী। নাচতে পারেন, গাইতে পারেন। কাব্যপাঠ এবং রচনাতেও তাঁর দক্ষতা আছে। সহস্রানীক, তিনিই তোমার বিধি-নির্দিষ্ট বধূ। তুমি রাজ্যে ফিরে তাকে বধূরূপে কৌশাম্বীতে আনবার আয়োজন কর।

এ কথা শুনে কেমন বিমনা হয়ে গেল সহস্রানীকের মন। কোথায় স্বর্গ, কোথায় ব্রহ্মলোক, কোথায় কৌশাম্বী কোথায় অযোধ্যায়! বিধুমা-অলম্বুশ, সহস্রানীক-মৃগাবতী—আচ্ছা কি ইঙ্গিত করছিলেন তারা ব্রহ্মার সামনে! তাঁর তো কিছুই মনে নেই, মৃগাবতীর কি আছে? সহস্র প্রশ্নে তাঁর মন কোথায় হারিয়ে গেল। তিনি স্বর্গের নির্জন পথে আনমনা ঘুরতে থাকলেন।

এক উপবনের প্রবেশ বীথিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিলোত্তমা। তিনি সহস্রানীককে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, স্বাগত যুবরাজ! ভাল আছেন তো!

কোন কথাই কানে গেলে না সহস্রানীকের। কিন্তু ক্রুদ্ধ হলেন তিলোত্তমা। বললেন, যাকে চিন্তা করতে করতে আমার ডাক শুনতে পেলে না, তার সঙ্গে তোমার চোদ্দ বছরের বিচ্ছেদ হবে।
অভিশাপের এক বর্ণও কানে গেলনা সহস্রানীকের। এটা শুনলেন মাতলি। তিনি তিরস্কার করলেন তিলোত্তমাকে। কিন্তু তিরস্কারে তো অভিশাপ ফেরে না। তাই অনুতপ্ত তিলোত্তমা বললেন, এ অভি-শাপের কথা জানলে তাঁর শোকের তীব্রতা কমবে। এ বিচ্ছেদে তাঁদের কারোই কোন ক্ষতি হবে না।

উৎসব শেষে কৌশাম্বীতে ফিরে এলেন সহস্রানীক। মন্ত্রী ও সেনাপতিকে জানালেন সব কথা। তারা বললেন, পূর্ব জন্মের কথা যাই হোক, এ জন্মে মৃগাবতী আপনার যোগ্য কন্যা। তা হ'লে অযোধ্যায় ভাট পাঠান হোক।

এদিকে অযোধ্যাতেও কৃতবর্মার প্রাসাদে চলেছে আর এক নাটকের

অভিনয়। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রানী কলাবতী হঠাৎ জেগে উঠলেন। ডাকলেন মহারাজাকে। বললেন, আমি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি। এক জটাজুটধারী মহাপুরুষ এসে আমায় বললেন, কন্যার বিবাহের জন্য তোমরা আয়োজন করছ না কেন ?

কলাবতী হাত জোড় করে বললেন, যোগ্য পাত্র কোথায় প্রভু !

তিনি কলাবতীর সামনে এক অবাক-করা দৃশ্যের পর্দা তুলে দিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মার সামনে এক অপ্সরা আর অপ্সর অভিশপ্ত হলেন। অপ্সরাটি ছোট্ট হয়ে এসে বসল কলাবতীর কোলে আর অপ্সরটি কোথায় যেন নক্ষত্রের মত বেগে ছিটকে গেল।

মহাপুরুষ বললেন, ঐ অপ্সরই জন্মেছে কৌশাম্বীতে সহস্রানীক নামে। তার সঙ্গে কন্যার বিবাহের আয়োজন কর।

কৃতবর্মা ডাকলেন মন্ত্রী এবং পুরোহিতদের। তারা সব শুনে, গুনে গেথে, বললেন, এ বিবাহ বিধি-নির্ধারিত। আপনি এখুনি ভাট পাঠান কৌশাম্বীতে।

দুই ভাটের দেখা হ'ল মাঝ পথে। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে, প্রস্তাব বদল করে ফিরে গেল নিজ নিজ রাজ্যে। দুরাজ্যেই সানাই বেজে উঠল। শুরু হ'ল উৎসব। দু'রা'জ্যর প্রজাদের মধ্যেও শুরু হ'ল মাতামাতি। শুভদিনে সহস্রানীকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল মৃগাবতীর।

এমন সময়েই মন্ত্রী যোগান্ধর, সেনাপতি সুপ্রতীপ এবং বিদূষকের এক এক পুত্র জন্মাল। রাজা নিজেই এঁদের নাম রাখলেন, যৌগন্ধরায়ন, রুমান্বস, এবং বসন্তক। এঁরা পিতার স্থানাভিষিক্ত হওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে শুরু করল।

এদিকে মৃগাবতী সন্তান-সম্ভবা হলেন। রাজধানীতে সকলেই আনন্দিত। রাজার যদি পুত্র হয় তবে—তিনিই হবেন উত্তরাধিকারী—ভবিষ্যতের রাজা ! সকলেরই আগ্রহ, সকলেরই উৎকণ্ঠা।

এমন সময় রাণী বললেন, মহারাজ ! আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারছি না। একটা সাধ আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

সহাস্রানীক বললেন, তোমার কোন সাধ অপূর্ণ থাকে রাণী। বল, এত সংকোচ কিসের !

রাণী বললেন, যে সাধ আপাত বীভৎস। তাই বলতে আমার এত সংকোচ, এত দ্বিধা ! কিন্তু যখন মনে হয় সরোবরে লাল ঢেউ সূর্যের আলোতে নাচছে, তাতে ফুটে উঠেছে লাল পদ্ম, সূর্যের আলো চারদিকে ঠিকরে পড়েছে লাল হয়ে আর তারই মধ্যে আমি—মহারাজ, আপনি আমায় একটি রক্তের সরোবর করে দিন।

রক্তের সরোবর ! কি বীভৎস, কি বীভৎস ! শিউরে উঠলেন রাজা। রাণী কি রাক্ষসী ! রাণী কি পিশাচী ! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল স্বয়ং ইন্দ্রের কথা। রাণী তো তারই জন্ম-জন্মান্তরের স্ত্রী ! তবে ?

অবশেষে সহাস্রানীক ভাবলেন, নিশ্চয় এর মধ্যে কোন দৈব-অভিপ্রায় আছে। তাই রাণীর এমন সাধ। তাই তিনি মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করে সত্যিই এক রক্তের সরোবর করে দিলেন। সরোবর দেখে রাণী খুব খুশী। বললেন, মহারাজ আমি এমন সরোবরই মনে মনে ভেবেছিলাম। কাল ভোরে আমি এই সরোবরেই স্নান করব।

না, রাজা সত্যিই সহস্র মানুষ বা পশু কেটে তার রক্তে সরোবর তৈরী করেন নি। আসলে নানা রঞ্জক দ্রব্য দিয়ে পুকুরের জলকে করে তোলা হয়েছিল রক্তের মত লাল। রাণী নিজেও তার স্বপ্নের সরোবরকে ঠিক বুঝতে পারেন নি। লালকে ভেবেছিলেন রক্ত। লালচে জলের সেই সরোবরকে রক্ত-সরোবর ভেবে রাণী খুব খুশী।

পরদিন, রাজাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সরোবরে স্নান করতে নামলেন রাণী। সত্যিই সে এক অপরূপ দৃশ্য। সূর্যের আলোতে লালদীঘি যেন হাসছে। চারদিকে লাল আলোর ফোয়ারা। তীরের সবুজ উপবনে লালচে আলো যেন আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে। এ যেন নন্দন-কাননে হোলি-উৎসব। তারই মধ্যে চাপাকলির মত কোমল বর্ণের রাণীর দেহ-ছায়াকে মনে হচ্ছে যেন মৎস্যকন্যার চপললীলা।

ওপর থেকে এক মহাপক্ষীও বোধহয় রাণীকে মৎস্যকন্যাই ভাবল।

হঠাৎ ছোঁ মেরে টেনে তুলল রাণীকে। রাণী চিৎকার করলেন। কিন্তু পাখীটি মুহূর্ত্তে শূন্যে উঠে উড়তে লাগল।

পাড়ে দাঁড়িয়ে রাজা সহস্রানীক কিছু বুঝবার আগেই পাখীটি আকাশে মিলিয়ে গেল। রাজা তখন হায় হায় করে উঠলেন। প্রহরীরা ছুটে এলো—কিন্তু পাখীটি তখন কোথায় কোন মেঘের কোণায় হারিয়ে গেছে তা কে জানে!

ভীষণ ভেঙ্গে পড়লেন রাজা। কোথায় রাজপুত্রের আগমনে রাজপুরী ঝলমল করে উঠবে, তা নয়, হারিয়ে গেলেন স্বয়ং রাজরাণী! নিজের চোখের সামনে ঘটল পুরো ঘটনা, অথচ তিনি কিছুই করতে পারলেন না, এই দুঃখ তাঁকে আরও ভেঙে দিতে থাকল। তিনি চারদিকে অজস্র চর পাঠালেন। কিন্তু বৃথা, বৃথা। কেউ মৃগবতীর সংবাদ আনতে পারল না।

এমন সময় স্বয়ং মাতলি এসে সহস্রানীককে জানলেন তিলোত্তমা অভিশাপ সংবাদ। তা শুনে রাজা বুঝলেন যে, বিধি এ বিচ্ছেদ জ্বালা অনেক আগেই তাঁর জন্য বরাদ্দ করে রেখেছিলেন। কিন্তু চৌদ্দ বছর বইতে হবে এ জ্বালা! হা ঈশ্বর, সে যে অনেক কাল!

* * *

এদিকে পাখিটি মৃগাবতীকে নখে বাধিয়ে উড়তে উড়তে ভাবতে লাগল, মাছতো পেয়েছি মস্ত। কিন্তু এটি এত চিৎকার করে কেন? এমন চিৎকার করা মাছতো কখনও পাই নি! এটিকে তা হ'লে ভাল করে দেখে শুনে খেতে হবে।

এই ভেবে সে বসল গিয়ে পাহাড়ের মাথায়। কিন্তু, বসেই চমকে উঠল সে। কোথায় মাছ। এ যে একটা মানুষ! ছলের অভাব নেই মানুষের। না জানি কি ফন্দি করে মাছ সেজে বসে ছিল। হয়ত' আমাকে জ্যান্তো ধরাই লক্ষ্য। হয়ত'—ও বাবা! দরকার নেই মানুষ খেয়ে। এই ভেবে ভয়ের চোটে পাখিটি মৃগাবতীকে ফেলে তাড়াতাড়ি পালাল।

পাখি চলে যেতে উঠে বসলেন মৃগাবতী। পাখির হাত থেকে মুক্তি

পেয়ে কিছুটা স্বস্তি পেলেন। কিন্তু সে স্বস্তি বেশিক্ষণ রইল না। এ কোথায় এনে ফেলল পাখিটা। চারদিকেই পাহাড় আর পাহাড়! এখান থেকে নামবেনই বা কি ভাবে? বাঁচবার আশাই বা কোথায়! আর স্বামীর কাছে ফেরা! হা ভগবান, এ কি বিপদে তুমি ফেললে? মৃগাবতী হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

মৃগাবতী দেখতে না পেলেও ঐ পাহাড়ের অদূরে ছিল ঋষি জমদগ্নির আশ্রম। তার পুত্র এসেছিল ফলমূল আহরণে। তার কানে গিয়ে পেঁাছাল মৃগাবতীর কান্না। পাহাড়ের চূড়ায় কে কাঁদে? মুনি পুত্র পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে থাকলেন।

ততক্ষণে মৃগাবতী স্থির করে ফেলেছেন যে এমন বিড়ম্বিত জীবন তিনি রাখবেন না। না-খেয়ে, না-বিশ্রামে এমন বিজন পাহাড়ে তিলে তিলে মরার চেয়ে একবারে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবেন। তিনি রাজপুত্রী, রাজবধূ। তাঁর শশুর স্বর্গেদধারের যুদ্ধে প্রাণদান করেছেন। তিনি তো সাধারণ নন্। অতএব—

এমন সময়ই ঋষিকুমার এসে দাঁড়ালেন তাঁর পিছনে। বললেন, আপনি কে মা!

মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ফিরে তাকালেন মৃগাবতী! হাত জোড় করে বললেন, আমাকে রক্ষা করুন দেব।

নিশ্চয়ই! আত্ম পরিচয় দিল ঋষিকুমার। তারপর বলল, আপনি জমদগ্নির আশ্রয় লাভ করেছেন। আপনি নির্ভয় হন।

ধীরে ধীরে পথ দেখিয়ে মৃগাবতীকে নামিয়ে আনল মুনিপুত্র। জমদগ্নি সব শুনে বললেন, তোমাদের ওপর এক অভিশাপ আছে। তার ফলে তোমাকে দীর্ঘ বিচ্ছেদ সইতে হবে মাত্র। এখানেই তোমার এক পুত্র জন্মাবে। সেই পুত্র থেকেই হবে তোমাদের মিলন। দুঃখ দূর কর। মন প্রসন্ন কর। সব কিছুকে সহজভাবে মেনে নাও। তোমার পুত্র মহত হোক।

ঐ আশ্রমেই এক সন্তান জন্মাল মৃগাবতীর। পুত্রই বটে। কৌশাম্বীর ভাবী-রাজা। পুত্রের মুখ দেখে মৃগাবতী অনেক দুঃখ ভুলে গেলেন।

জমদগ্নি বললেন, মা। এখন তোমার আমার মস্ত দায়িত্ব। রাজপুত্রকে রাজোচিত শিক্ষায় বড় করে তুলতে হবে। যে দিন মহারাজ সসৈন্যে আসবেন তোমাদের বরণ করতে সেদিন পুত্র উদয়নকে দেখে যেন গর্বে তাঁর বুক ভরে ওঠে।

মুনির কথায় বুকের মধ্যে পুত্রকে জড়িয়ে ধরলেন মৃগাবতী। তার চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল ঝরতে থাকল।

* * *

মুনির আশ্রমেই বড় হয়ে উঠলেন উদয়ন। জমদগ্নি যথাসময়ে তাকে ক্ষাত্রিয়োচিত সংস্কারাদি করালেন। নিজেই শেখাতে থাকলেন অস্ত্রচালনা, শাস্ত্রপাঠ। রাজ্য পরিচালনার নানা নীতি, নানা কলাবিদ্যা। এক কথায় সব দিক থেকে উদয়নকে পুষ্ট ও পরিণত করে তুলতে থাকলেন মুনি।

পুত্রের দিকে তাকিয়ে মৃগাবতীরও যেন চোখের পলক পড়ে না। পুত্র যেন স্বামী সহস্রানীকের এক প্রতিমূর্ত্তি। পুত্রের গুণপনায় তার বুক দুলে ওঠে। আনন্দে আবেগে তিনি নিজ হাতের বালা খুলে পরিয়ে দিলেন পুত্রের হাতে। পিতার নামাঙ্কিত বালা পুত্রের হাতে থাক—পিতার স্পর্শ ও আশীর্বাদের মত।

উদয়নের এক নেশা আছে বনে বনে ঘুরে বেড়ান। সব সময়েই সে যে শিকার করে এমন নয় তবু বনে ঘুরলে তার মন কি এক খুশিতে ভরে ওঠে। একদিন সে এক ব্যাধকে দেখল এক মস্ত সাপ ধরে অন্ধকার খাঁচায় ভরছে। উদয়নের মনে হ'ল সাপটার চোখ ছলছলে, বেদনায় যেন তার অঙ্গ অবশ। তার সাপটার জন্য মন বড় চঞ্চল হ'ল। সে ব্যাধকে বলল, ভাই, তুমি এ সাপটাকে ছেড়ে দাও। ওর জন্য আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

ব্যাধ বলল, কষ্ট যে আমারও না হয় তা নয়। বনের স্বাধীন সাপ, তাকে ধরে বন্দী করে রাখি। খেলাই। ওর জীবনটাই বরবাদ। কিন্তু কি করব! ওর জীবনের বদলেই যে আমার জীবন বাঁচে। ওকে

ছাড়লে যে আমায় মরতে হবে ভাই। দুঃখ হলেও ত' ওকে ছাড়বার উপায় নেই। পেট ত' কথা শোনে না। অবুঝ।

উদয়ন এদিক ওদিক তাকাতেই চোখ পড়ল হাতের বালায়। সেটা খুলে সে ব্যাধকে দিল। বলল, এই বালাটা নাও তুমি। এটা বিক্রি করলে, তোমার অনেক দিনের ভরণপোষণ চলবে। ওটাকে ছেড়ে দাও।



ব্যাধ বালা পেয়ে খুশী মনেই ছেড়ে দিল সাপটিকে। মুক্তি পেয়েও সাপটি পালাল না! ব্যাধ চলে যেতে সাপটি উদয়নকে বলল, আপনার ঋণ আমি জীবনে ভুলব না। আপনি আমার জীবন দান করেছেন। আপনাকে আমি কিছু দিব্য দান করব।

উদয়ন বুঝলেন যে, সাপটি সাধারণ কেউ নয়। তাই তো জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কে! কি আপনার পরিচয়!

সাপটি বলল, আমি সর্পরাজ বাসুকির জ্যেষ্ঠ। আমার নাম বসুনেমি। এখন বয়স বেড়েছে। আগের মত আত্মরক্ষা করতে পারি না। ব্যাধটি তাই সহজেই আমাকে বন্দী করে ফেলেছিল।

এই বলে বসুনেমি উদয়নকে এক বীণা দান করল। সে বীণার দিব্যতন্ত্রী এমন রব তোলে যে সে রবে বনের পশু সুরমুগ্ধ হয়ে স্থির হয়ে যায়। তার আর নড়বার শক্তি থাকে না। এর সঙ্গে সে আরও

দুই বিদ্যা শিখিয়ে দিল উদয়নকে। এক বিনাসুতোয় মালা গাঁথতে আর দ্বিতীয় কপালে চিরোজ্জ্বল তিলক ধারণ করতে।

এই তিন দান নিয়ে উদয়ন ফিরে গেল আশ্রমে।

এদিকে উদয়নের বালা নিয়ে ব্যাধ গেল এক সেঁকরার কাছে বিক্রি করতে। সেঁকরা বালাটা ভাঙ্গতে গিয়ে চমকে উঠল। এতো রাজার নামাঙ্কিত বালা। হ্যাঁ, ঠিক তাই! চোখ বড় হয়ে উঠল তার। ব্যাধকে বলল, কোথায় পেলে এ বালা!

কেন! এক মুনির ছেলে দিয়েছে!

তোকেই বা বালা দিল কেন?

ব্যাধ সাপ ধরা থেকে ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত গোটা ঘটনা বলল। কিন্তু বিশ্বাস হ'ল না সেঁকরার। সে সংগে সংগে কোতোয়ালকে ডেকে ধরিয়ে দিল ব্যাধকে।

কোতোয়াল রাজার বালা দেখে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ব্যাধকে একেবারে প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠিয়ে দিল কৌশাম্বীতে। প্রধান বিচারপতি বালা সনাক্ত করাবার জন্য একেবারে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন। রাজা বালা দেখে চমকে উঠলেন। পুরোন শোক তাঁর উথলে উঠল। রাজা বললেন, কে এনেছে এ বালা। তাকে এখানেই নিয়ে এসো।

সংগে সংগে ব্যাধকে নিয়ে আসা হ'ল রাজার কাছে। তিনি বললেন, এ বালা কি ভাবে পেলে তুমি! তুমি কি কোন নারীকে হত্যা করে এ বালা পেয়েছ!

ব্যাধও ততক্ষণে চমকে উঠছে। এ সে কাকে দেখছে তার সামনে। যে বালা দিয়েছিল তারই যেন প্রৌঢ় রূপ। সেই যুবকই কি এখানে এসে বসে আছে! এ কদিনেই তার এত বয়স বেড়ে গেছে! সে কি যাদুর বালা হাতে পেয়েছে! সবই কি যাদুর খেলা। ব্যাধ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। আমাকে তোরা যাদু থেকে মুক্তি দে। চাই না ও যাদুর বালা। না খেয়ে থাকব তবু ও যাদু থেকে মুক্তি চাই।

সকলে মিলে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করল ব্যাধকে। তার কাছ থেকে

সব শুনে আর কারো সন্দেহ রইল না যে, যে যুবক বালা দিয়ে সাপকে মুক্ত করেছে, সে সহস্রানীকের পুত্র। আর নিশ্চয় ঐ মুনির তপোবনে আছেন রাণী মৃগাবতী!

আর দেরী নয়। সংগে সংগে রাজা পাত্রমিত্র সহ বেরিয়ে পড়লেন। রাজার দায়িত্ব রইল মন্ত্রী এবং সেনাপতির ওপর। রাজাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ব্যাধ।

জমদাগ্নর তপোবনে দীর্ঘ চোদ্দ বছর পর মিলন হ'ল মহারাজ সহস্রানীকের সংগে মৃগাবতীর। পুত্র উদয়ন প্রথম দেখল পিতার মুখ। মিলনের আনন্দস্রোত বয়ে গেল তপোবনের প্রান্তরে।

কৌশাম্বীতে ফিরে এলেন রাজা। আনন্দস্রোত এখানেও। হঠাৎ একদিন রাজা অবাক হয়ে দেখলেন, মৃগাবতীর মাথায় কোন কোন কেশ সাদা হয়ে উঠেছে। তাহলে তার মাথায়? সংগে সংগে দর্পণ আনতে বললেন পরিচারিকাকে। হ্যাঁ। তাঁর কানের দু পাশতো সাদা হয়ে উঠেছে—বয়স উড়িয়েছে তার বিজয়কেতন। হাসলেন রাজা। বললেন, রানী! আর নয়। এবার পুত্রকে রাজ্য বুঝিয়ে দিয়ে চল সন্ন্যাসযাত্রায়।

রাণী বললেন, চলুন মহারাজ। দীর্ঘ অনভ্যাসে রাজৈশ্বর্য আমার ভালও লাগছে না।

রাজ্যে সাজো সাজো রব পড়ে গেল। এক সংগে চার চারটি অভিষেক। আজ সিংহাসনে উদয়ন, মন্ত্রীপদে যোগান্ধরের পুত্র যৌগন্ধরায়ন, সেনাপতিপদে সুপ্রতীপের পুত্র রুমান্বসু আর রাজবয়স্য পদে বসন্তক।

এই অভিষেক পর্ব মিটলে শুধু রাজা রাণী নন্, মন্ত্রী, সেনাপতি এবং বিদূষকও সস্ত্রীক চললেন সন্ন্যাসযাত্রায়।

নতুন মন্ত্রী, সেনাপতি ও বিদূষক নিয়ে উদয়ন রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করতে থাকলেন।



উদয়ন বাসবদত্তার কথা

মহারাজ সহস্রানীক সন্ন্যাস গ্রহণের পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। এখন কৌশাম্বীর মহারাজা উদয়ন, মহামন্ত্রী যৌগন্ধরায়ন, সেনাপতি পদে রুমান্বাস। রাজবয়স্য যে বসন্তক সেকথা না বললেও চলে।

রাজা মন্ত্রী সেনাপতি একত্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে যারা ভেবেছিল, এবার মওকা পাওয়া গেল, ঐ অনভিজ্ঞ রাজা উদয়ণ, মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ এবং সেনাপতি রুমান্বাসকে পরাস্ত করে খুব সহজেই কৌশাম্বী নিজের রাজ্যের ভেতরে ঢুকিয়ে নেওয়া যাবে, তারা ঠেকে শিখল যে অনভিজ্ঞ হলেও এরা শক্তিতে কম ন'ন। যুদ্ধশাস্ত্রটা সেনাপতির বেশ দখলে, মন্ত্রীমশাই মন্ত্রণাতে কম যান না, আর স্বয়ং রাজা রূপে গুণে, শৌর্যে বীর্যে, আমোদে বিলাসে বদান্যতায়—কিসে কম! তারা ঠেকে স্বীকার করল, এরা যোগ্য উত্তরাধিকারী। বৎসরাজ্য সত্যিই অনন্য।

এই রাজ্যের তিন নবীন কর্ণধারের মধ্যে সুপ্রীতির সম্পর্কও কম দৃঢ় নয়। একে অন্যকে ভালবাসেন প্রাণ দিয়ে। আরও একজন মানুষ হচ্ছেন বসন্তক। বৃত্তিতে বিদূষক হলেও সকলের প্রতি ভালবাসায় সেও একান্ত আপনজন।

এরা সকলেই পুরোপুরি গৃহস্থ। পুত্রকন্যা স্ত্রী-পরিজন নিয়ে বৃহৎ সংসার। এক রাজাই অবিবাহিত। পরিজনেই পূর্ণ তার সংসার। রাজা নিষ্ঠার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করেন। তারপর তার দু'টি ব্যসন। এক, সেই অপূর্ব বীণাবাদন আর শিকারযাত্রা। বীণাবাদনেও যেমন তাঁর জুড়ি নেই, তেমনি শিকারেও তিনি অদ্বিতীয়।

মন্ত্রী পরিষদ তাকে বলেন, মহারাজ বিবাহ করুন।

মহারাজ উদয়ন হেসে বলেন, প্রয়োজন কি? সঙ্গীতে শিকারে রাজকার্যে আমার জীবন তো সুখের। আমি পরিতৃপ্ত।

মন্ত্রীরা বলেন, রাজপুরী উত্তরাধিকারী শূন্য থাকা ত' ঠিক নয়। এজন্যই মহারাজের বিবাহ প্রয়োজন।

মহারাজ বলেন, বিবাহের যোগ্য কন্যারত্ন কোথায়!

এ প্রশ্নে মন্ত্রী পরিষদ থমকে যান।

সত্যিই কৌশাম্বীর মহারাজ উদয়নের বিবাহযোগ্যা পাত্রী কোথায়? তিনি তো আর যে সে ঘরে বিয়ে করতে পারেন না! রাজার ঘর চাই। উপযুক্ত কন্যা চাই, যোগ্যমত সমাদর চাই, তবে না রাজার বিয়ে!

তবে, হ্যাঁ পাত্রী আছে। উজ্জয়িনীর মহারাজা চণ্ডমহাসেনের কন্যা বাসবদত্তা। অমন রূপ বা গুণ কজন মেয়েরই বা হয়। আর হবেই বা কেন! ইনি যে ইন্দ্রের বরে জাত। আর সেইজন্যই তো তার নাম বাসবদত্তা। কিন্তু—

এই কিন্তু নিয়ে চিন্তিত ছিলেন বাসবদত্তার পিতা উজ্জয়িনী-রাজ মহাচণ্ড সেনও। কন্যা বিবাহযোগ্যা হয়েছে। যার তার হাতে তো কন্যাকে দেওয়া যায় না। রাজকুলে তেমন পাত্র কে? আছে বটে একজন। তিনি বৎসরাজ উদয়ন। কিন্তু—

মহাচণ্ডসেনের মন চলে গেল অতীতে। তাঁর পিতামহ মহেন্দ্রবর্মা

প্রথম রাজ্যস্থাপন করেন এই উজ্জয়িনীতে। দুর্ভেদ্য করে তোলেন রাজ্য এবং রাজধানী। চারিদিকে দুর্গ আর পরিখা। তারপর তাঁর পুত্র জয়সেন বাড়ালেন রাজ্যের সীমা। ঠিক তখন থেকেই বৎস রাজ্যের সঙ্গে তাদের রেষারেষি শুরু হ'ল।

যখন মহাসেন নিজে রাজ্য পেলেন তখনও তার মনে ঈর্ষার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। নিজেকে শক্তিশালী করতে তিনি বসলেন তপস্যায়। দীর্ঘ তপস্যাতেও দেবী চন্ডীর আশীর্বাদ না পেয়ে তিনি নিজ দেহ থেকে আপন হাতে মাংস কেটে যজ্ঞে আহুতি দিতে থাকলেন। অবশেষে আবির্ভূতা হলেন দেবী। নিজ হাতের খড়্গ দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, এই খড়্গ হাতে নিলে তুমি হবে অজেয়। এই অস্ত্রে তুমি বধ করবে এক প্রবল প্রতাপ অসুরকে। তার কন্যা হবে তোমার স্ত্রী। তোমার জীবনের সব কামনাই পূর্ণ হবে।

রাজধানীতে ফিরলেন মহাসেন। চন্ডীর আশীর্বাদ লাভ করে এসেছেন বলে তার নাম হ'ল চন্ড মহাসেন বা মহাসেন।

এর কিছু কাল পরেই তিনি গেলেন মৃগয়ায়। সেখানে এক বিচিত্র কান্ড ঘটল। এক বন্য বরাহকে তীর মারলেন তিনি। সে তীরবিদ্ধ হ'ল। কিন্তু মরল না—পালাল। জেদ চেপে গেল মহাসেনের। তিনি পিছু ধাওয়া করলেন। বরাহটি এক বিশাল সুড়ঙ্গপথে ছুটল। মহাসেনও ছুটলেন সুড়ঙ্গের ভেতর। কিছুদূর গিয়েই হঠাৎ সুড়ঙ্গ এক বিশাল দীঘির সামনে এসে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু বরাহটি কোথায়? খানিক খুঁজে হতাশ এবং ক্লান্ত হয়ে মহাসেন বসে পড়লেন দীঘির পাড়ে। শীতল বাতাস তাঁর ক্লান্তি দূর করে দিল।

একটু পরে হঠাৎ চমক ভাঙল তাঁর। কে যেন মধুর স্বরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, কে আপনি? এখানে কিভাবে এলেন? এলেনই বা কেন?

ফিরে তাকালেন মহাসেন। তাঁর অদূরে দাঁড়িয়ে এক অপরূপা কুমারী কন্যা! কে ইনি! হঠাৎ নজরে পড়ল, আরও পিছনে প্রায় গাছ-পালার মত অনড় হয়ে তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে আরও অনেক সুন্দরী কন্যা! কে এরা!

আগেই মেয়েটি আবার বলল, কে আপনি? তা তো এখনও বললেন না!

মহাসেন নিজের পরিচয় দিলেন। কিভাবে এসেছিলেন, তাও বললেন।

সব শুনে মেয়েটির মুখ কালো হ'ল। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকল।

মহাসেন বললেন, দেবী! আপনি কাঁদছেন কেন? আমি কি আমার কথায় কোথাও আঘাত দিয়েছি আপনাকে?

মেয়েটি চোখ মুছে বলল, না মহারাজ। আপনি কোন আঘাত দেন নি। কিন্তু কিভাবে আপনাকে রক্ষা করব! আপনি জানেন না যে আপনি কি ভয়ঙ্কর জায়গায় এসেছেন।

মহাসেন হাসলেন। বললেন, আপনি নির্ভয় হন। আমি দেবীর আশীর্বাদ প্রাপ্ত। আমি এই খড়্গ-হস্তে দাঁড়ালে অজেয়। আপনি আমাকে সব খুলে বলুন।

এবার মেয়েটির মুখ প্রসন্ন হ'ল। বলল, তবে বোধ হয় আপনি দৈবপ্রেরিত। শুনুন, আমার নাম অঙ্গারিকা। আমার বাবার নাম অঙ্গারক। এ অঞ্চলের তিনি রাজা। তিনি দৈত্যরাজ। এক সময় তাঁর ছিল দয়ার শরীর।—মহৎ হৃদয়। কিন্তু কোন ঋষির শাপে তিনি আজ হীন অসুর— মহাবলী। ঐ যে একশ' কন্যাকে দেখছেন, এঁরাও রাজকুমারী। এঁদের বাবাদের পরাজিত করে আমার বাবা এঁদের বন্দী করে এনেছেন। আপনি যে বরাহের পেছনে ছুটে এসেছেন, তিনিই ছদ্মবেশী দৈত্যরাজ। আজ ক্লান্ত ছিলেন, তাই আপনি রক্ষা পেয়েছেন। নিদ্রা থেকে উঠে তিনি আপনাকে সংহার করবেন।

মহাসেন বললেন, তবে আমাকে দৈবপ্রেরিত বললেন কেন?

অঙ্গারিক বললেন, বাবার কাছে শুনেছি এক খড়্গহস্ত নর তাকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করলে তবে হবে তাঁর মুক্তি। এবং—

থেমে গেলেন অঙ্গারিক। মহাসেন জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন দেবী! এবং বলে থামলেন কেন?

আঙ্গরিকা চোখ তুলে মহাসেনকে একবার দেখে আবার চোখ নত করলেন। তারপর বললেন, বাবার কাছে শুনেছি, সেই বীরই আমাকে বিয়ে করবেন।

মহাসেনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমিই সেই বিধি নির্দিষ্ট খড়্গহস্ত বীর। বলুন, কোথায় আপনার পিতা!

অঙ্গারিকা বললেন, হে বীর, আপনি যতই বিধি প্রেরিত হন আপনি যাবেন না। কেন না দেব আশীর্বাদে বাবাও অজেয়। তাঁর মৃত্যুর উপায় না জানলে তাঁকে হত্যা করা সম্ভব নয়।

তাঁর মৃত্যুর উপায়?

আমিও জানিনা, বললেন, অঙ্গারিকা।

তখন মহাসেন বললেন, এক কাজ করুন দেবী। আপনি গিয়ে আপনার বাবার শিয়রে বসে কাঁদতে থাকুন। বাবা কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, হঠাৎ আপনার মৃত্যু হলে আমার কি দশা হবে! আমাকেও কি অন্য কোন প্রবল ব্যক্তি বন্দী করে নিয়ে গিয়ে দাসী করবে?

অঙ্গারিকা এমন করতে রাজী হ'ল। তার একশ' সখি মহাসেনকে নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে গেল প্রাসাদে। এক দরজার পাশে আত্ম-গোপন করে রইলেন মহাসেন। অঙ্গারিকা বাবার শিয়রে বসে কাঁদতে থাকলেন।

দৈত্যরাজ উঠে বসলেন। সত্যিই কি বীরের মত চেহারা। সমুন্নত দেহ। বিশাল কাঁধ। হাত দুটি যেন দুটি শাল গাছের কোঁড়া। মহাসেন বুঝলেন ঐ হাতে আকর্ষণ করে তীর ছুঁড়লে কি ভীষণ শক্তিই না যুক্ত হবে তাতে।

মেয়ের কান্নায় দৈত্যরাজ বিস্মিত হলেন। বললেন, কি মা! তোমার চোখে জল কেন? কে তোমায় দুঃখ দিয়েছে মা, কিসের দুঃখ!

মেয়ে বললেন, দঃখ কেউ দেয় নি বাবা। আমার ঐ বন্দী রাজকুমারী সখিদের দেখলেই কান্না পায়।

কেন, কেন?

তোমার তো বয়স হয়েছে। হঠাৎ যদি তোমার মৃত্যু হয়! আমাকেও কি কেউ এসে বন্দী করে নিয়ে যাবে?

দৈত্যরাজ সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, পাগলি মেয়ে আমার। কিসের ভয় তোমার। আমার মৃত্যু অত সহজ নয়। এই দেখ, আমার বাম হাত একবার ইন্দ্রের বাণে ফুটো হয়ে যায়। দেবীর আশীর্বাদে এ ফুটো দিয়ে কোন বীর তীর মারতে পারলে তবেই আমার মৃত্যু। কিন্তু এ ফুটো তো ঢাকা থাকে ধনুকে। অসম্ভব আমার মৃত্যু! বলে হো হো করে হেসে উঠলেন অঙ্গারক। সত্যিই নির্ভয় হাসি।

মৃত্যুর চাবিকাঠি জেনে নিলেন মহাসেন। পরদিন দৈত্যরাজ যখন দেবীর আরাধনায় বসেছেন, তখন সেখানে যোদ্ধার বেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন মহাসেন। বললেন, বর্বর বরাহ। তুমি ছলনা করে আমাকে এই দৈত্য পুরীতে টেনে এনেছ! এখুনি তোমাকে আমি হত্যা করব।

ধ্যান ভেঙ্গে গেল দৈত্যরাজ অঙ্গারকের। তিনি বললেন মহাসেনকে। এই তাঁকে তীরবিদ্ধ করেছিল। তিনি মন্ত্র জপ করা বন্ধ না করেই বাম হাত তুলে একটু অপেক্ষা করতে বললেন।

মহাসেনের মহা সুযোগ। ফুটোটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তিনি তার সংযোগ করলেন ধনুকে। ছুড়লেন। তার ফুটোর ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর্তনাদ করে পড়ে গেলেন অঙ্গারক। বললেন, হেবীর! হে আমার মুক্তিদাতা! তোমার জীবন সুখের হোক। তোমার সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক! শুধু তোমার কাছে অনুরোধ, আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করো তুমি! আমি তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম।

বাবার আর্তনাদ শুনে ছুটে এলেন অঙ্গারিকা। তিনিও আর্তনাদ করে উঠলেন। কেঁদে ফেললেন। অঙ্গারক বললেন, কেঁদো না মা! এ আমার মৃত্যু নয় মুক্তি। তুমি এই বীরপুরুষকে বিবাহ করো।

অঙ্গারক মারা গেলেন। সমারোহেই দাহ করা হ'ল। তারপর ঐ একশ রাজকুমারী সহ অঙ্গারিকাকে বিয়ে করে রাজ্যে ফিরে এলেন মহাসেন। সেই অঙ্গারিকাই উজ্জয়িনীর মহারানী।

মহারানীর দুই পুত্র হ'ল—গোপালক এবং পালক। খুশী মহাসেন পুত্রলাভের পর এক মহা উৎসব করলেন। স্বয়ং ইন্দ্র এলেন সে উৎসবে যোগ দিতে। অঙ্গারককে হত্যা করায় ইন্দ্র একেই খুশী ছিলেন, তার ওপরে এই উৎসবের সমাদরে ও আপ্যায়নে এত পরিতৃপ্ত হলেন যে, যাবার সময় বললেন, মহাসেন! আমি আশীর্বাদ করছি যে তুমি এক অলোক-সামান্যা রূপবতী কন্যালাভ করবে। শৌর্যে বশ হবে না যে শত্রু এ কন্যা তাকেই দান করো। সে শত্রু হবে তোমার পরম মিত্র।

সত্যিই ঘর আলো করা কন্যা জন্মেছে তাঁর। ইন্দ্রের ঘরে এ কন্যার জন্ম বলে নাম রাখা হয়েছে বাসবদত্তা। সে এখন বিবাহযোগ্যা। কিন্তু—

এ কিন্তুর উত্তর তো খুঁজে বের করতেই হবে। সেই উত্তর খুঁজতেই মহাসেন নিজের জীবনের কথা চিন্তা করা শুরু করেছিলেন। সেই সূত্রেই মনে পড়েছিল ইন্দ্রের আশীর্বাদের কথা। এই কন্যা দান করে শত্রুকে বশ করা যাবে। ঠিকই তো তাঁর মহাশত্রু বৎসরাজ উদয়ন। তাকে তিনি শৌর্যে বশ করতে পারেন নি। বশ করতে পারেন নি বুদ্ধি-কৌশলে। এ কথা ঠিক হলেও তাঁর মত যোগ্যপাত্র কোথায় সারাভারতে। কিন্তু কি ভাবে তাঁকে পাওয়া যেতে পারে জামাতা হিসাবে!

মন্ত্রী বুদ্ধদত্তের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন মহারাজ! সরাসরি বিবাহ প্রস্তাব পাঠান উচিত বিবেচনা করলেন না দুজনেই। যদি উদয়ন তা প্রত্যাখ্যান করেন তবে তা হবে খুবই অসম্মানেয়। উদয়নের পক্ষে প্রত্যাখ্যান করার সম্ভাবনাই বেশি। তা হ'লে?

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ! আমাদের কন্যা যেমন রূপবতী, তেমন গুণবতী। মহারাজ উদয়নকে যদি কোন ক্রমে বাসবদত্তার সম্মুখে আনা যায়, তিনি যদি একবার কন্যাকে দেখেন, তবে তিনি কিছুতেই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। কিন্তু তাঁকে আনা যায় কিভাবে?

অনেক আলোচনার পর দুজনেরই মনে হ'ল যে উদয়ন এবং বাসবদত্তা দুজনেই সংগীতপ্রিয়। এই দিক থেকে দুজনকে মিলিত করা যেতে পারে। কিন্তু তাই বা কিভাবে হবে?

শেষে স্থির হ'ল যে বৎসরাজের কাছে দূত পাঠান হবে যে, আমার

কন্যা আপনার সঙ্গীত প্রতিভায় বিমুগ্ধ। তিনি আপনার শিষ্যা হতে চান। আপনি অনুগ্রহ করে উজ্জয়িনীতে এসে তাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিলে আমরা অনুগৃহীত হব।

এই মর্মে দূত পাঠান হ'ল। কৌশাম্বীতে দূতকে মহা সমাদরে বরণ করলেন যোগন্ধরায়ণ। বিশ্রামের আয়োজন করে দিলেন। পরদিন রাজসভায় দূত তার সন্দেশ পরিবেশন করল।

দূতের বক্তব্য শুনে উদয়ন মনে মনে বিক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর মনে হ'ল এ প্রস্তাব দ্বারা প্রকারান্তরে তাঁর অসম্মান করা হয়েছে! তিনি কি পেশাদার সঙ্গীত শিক্ষক! দূতকে বললেন, আজ বিশ্রাম করুন। কাল জবাব দেব।

দূত সভা থেকে গেলে রাজা আলোচনায় বসলেন। সেনাপতি রুমন্বান বললেন, মহারাজ! এ প্রস্তাবে মহাসেনের ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে। এ অসম্মানের জবাব অস্ত্রে দেওয়া উচিত।

উদয়ন বললেন, আমারও মত তাই। সৈন্য সজ্জা কর।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, উত্তেজিত ভাবে কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। মহারাজ! মহাসেনের প্রস্তাব অতখানি হীন না হতেও পারে। আপনি মৃগয়া বাদ্য সঙ্গীত ইত্যাদি ব্যসনে এত মেতে আছেন যে মহাসেন আপনাকে কন্যাদানের প্রলোভনে বশ করতে চেয়ে থাকতে পারেন আবার সত্য সত্যও কন্যাদান করতে চেয়ে থাকতে পারেন। আগেই আক্রমণ না করে আগে আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার।

উদয়ন বললেন, উপায়!

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, তা স্থির করব আমি। আপনি দূতকে আবার আহ্বান করুন।

দূত এলে যৌগন্ধরায়ণ বললেন, দূতমশাই! আপনি মহারাজ চণ্ড মহাসেনকে বললেন যে মহারাজ উদয়ন তাঁর শিষ্যত্ব যাকে তাকে দেন না। পরীক্ষা নিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। রাজকুমারীর অভিলাষ যদি ঐকান্তিক হয়, তবে তাঁকে কৌশাম্বীতে আসতে হবে। শিষ্যত্ব অর্জন করতে হবে। তখন মহারাজ শিষ্যার বাড়ি গিয়ে শেখাতেও গররাজি হবেন না।

দূত সংবাদ নিয়ে চলে গেল। মহারাজ যৌগন্ধরায়ণের উপস্থাপনার দারুণ প্রশংসা করলেন। যোগ্য উত্তর হয়েছে।

মহাসেনেরও মনে হ'ল যোগ্য উত্তর হয়েছে। বুদ্ধদত্তও বললেন, মহারাজ! এইতো যথার্থ মানীর উত্তর।

মহাসেন বললেন, কিন্তু কন্যাকেই বা আমি পাঠাই কি করে! তাতে যে আমারও মান নষ্ট হয়।

বুদ্ধদত্ত বললেন, কন্যা পাঠান চলবে না মহারাজ। সহজ কথায় যখন হ'ল না, তখন কৌশলে উদয়নকে আনতে হবে উজ্জয়িনীতে।

কিন্তু কৌশল কি? কত ভাবনাই না ভাবা হ'ল। অবশেষে রাজা এবং মন্ত্রী উভয়েরই মুখে হাসি ফুটল। নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মন্ত্রী। কিছুদিনের জন্য রাজধানী থেকে ডুবও দিলেন। ফিরেও এলেন একদিন। বললেন, মহারাজ, আমরা প্রস্তুত। এক বিজ্ঞানবিদ্ এবং এক শিল্পী অসম্ভবকেও সম্ভব করেছে।

খুশি হয়ে উঠলেন মহারাজ মহাসেন। বললেন এবার তাহলে আমাদের পরিকল্পনার পরবর্তী অংশের জন্য কাজে লেগে যেতে হবে।

মন্ত্রী বললেন, সে কাজ শুরু হয়ে গেছে মহারাজ!

মহাসেন বললেন, এবার দেখা যাক বুদ্ধদত্তের বুদ্ধি কতখানি পাকা আর আমাদের জামাই বাবাজীবনই বা কতখানি বুদ্ধি ধরেন।

কৌশাম্বীতেও উত্তেজনা কম নয়। অমন একটা জবরদস্ত জবাব পাবার পরেও মহাসেন একেবারে নীরব হয়ে আছেন কেন? তিনি কোন্ চালের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন কে জানে! অথচ তাঁর কন্যা বাসবদত্তা সম্পর্কে যতই শোনা যাচ্ছে ততই উদয়নের তো বটেই সকলেই মনে হচ্ছে, প্রস্তাবটা মান-অভিমানে না জড়ালেই ভাল হ'ত।

চারদিক ভেবে যৌগন্ধরায়ণ বললেন, মহারাজ! মহাসেন নিঃসন্দেহে কোন চতুর পরিকল্পনায় আপনাকে উজ্জয়িনী নিয়ে যেতে ষড়যন্ত্র করেছেন বলে আমার বিশ্বাস।

রুমন্বাস বললেন, অসম্ভব। আমার সেনাবাহিনী প্রস্তুত থাকতে মহারাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে উজ্জয়িনীতে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, মহারাজ যদি স্বেচ্ছায় যান।

উদয়ন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, আপনি কি উন্মাদ হলেন মন্ত্রীবর! আমি স্বেচ্ছায় উজ্জয়িনীতে যাব গান শেখাতে! এমন ইচ্ছা আমার জাগবে কেন?

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, সেইটাই তো বুঝতে পারছি না মহারাজ! ওদের চালটার সেখানেই তো জোর। ওটুকু ভেদ করতে পারলে তো ওদের চালটাই ভ্যাস্তা করে দিতাম।

উদয়ন বললেন, আপনার বুদ্ধিতে জট বেঁধেছে!

যৌগন্ধরায়ণ হাসলেন। বললেন, জট দিয়েই জট খুলব। তবে আপনি কিছুদিন রাজধানী থেকে এক পাও বাইরে বের হবেন না।

কিন্তু যৌগন্ধরায়ণের এ নির্দেশ মানা উদয়নের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। মহারাজের কাছে ছুটে এলো বিন্ধ্যারণ্যের প্রজারা। হাতীর পাল নেমেছে বিন্ধ্যারণ্যে। তাদের চাষ গৃহ সব ধ্বংস করে দিচ্ছে। মহারাজ ভিন্ন কে রক্ষা করবে তাদের। ছুটে এলো মহারাজের প্রিয় শিকার-অনুচরেরা। তাদের সংবাদে আরও চঞ্চল হয়ে উঠলেন উদয়ন। ঐ হাতির পালের নেতা নাকি এক বিশালকায় হাতি। বর্ষার প্রথম মেঘের মত কালচে নীল তার গায়ের রং। একশ শাঁখ একত্রে বাজার মত তার বৃংহিত। কি ধীর মন্থর তার গতি। যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত—পৃথিবীতে এনেছে নির্ভয় বিচরণ করতে। অন্য হাতিগুলি যখন নির্বিচারে সব ধ্বংস করে, সে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে সব দেখে। কোথায় শত্রু তা সে ঠিক বোঝে। সেনাপতির মত সঙ্গে সঙ্গে সে হাতির দলকে নির্দেশ পাঠায়। এক সঙ্গে এসে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারীদের ওপর। ফাঁদ থাকলে তাও বোঝে। সেনাপতির নির্দেশে তারা পালায়। শিকার অনুচরেরা বলল, মহারাজ! এমন হাতি আমরা আগে দেখিনি। এ সাধারণ হাতি নয়—এ স্বয়ং গজরাজ!

উত্তেজনায় হাত পা নিশপিস করতে থাকল মহারাজ উদয়নের। তিনি বললেন, ঐ গজরাজকে আমার চাই। ওকে বন্দী করতেই হবে। চল, শিকার যাত্রায়!

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, এবার আপনার শিকারে না যাওয়াই ভাল মহারাজ! আর এ বছরেই এমন গজরাজের আবির্ভাব আমার মনে কেমন সন্দেহ জাগাচ্ছে।

হেসে উঠল শিকারীরা। বলল, হাতির পাল আসবার আবার এ-বছর সে বছর আছে না কি। এমন হাতি আসা সৌভাগ্যের ব্যাপার। এবার চলে গেলে আর সারা জীবনে না আসতেও পারে।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, মহারাজ! কে জানে, গোটা ব্যাপারটাই মহাসেনের সাজান কিনা! তাঁর মন্ত্রী বুদ্ধদত্ত কম কূটমন্ত্রের নন!

উদয়ন হাসিলেন। বললেন, যত কূটবুদ্ধিই থাক, এমন সব অভিজ্ঞ শিকারীর চোখে ধুলো দেওয়া অসম্ভব। আপনি অকারণে সন্দেহ করছেন। মহাসেন বা বুদ্ধদত্ত যত পারঙ্গমই হন না কেন, এখানে তাঁদের কোন যাদু টিকবে না।

অতএব সাজো সাজো রব পড়ে গেল কৌশাম্বীতে। মহারাজ তাঁর জীবনের সেরা শিকারে যাচ্ছেন। মহারাজের শিকারও বিচিত্র। তাতে হত্যার ষড়ঞ্জাম নেই। আছে নানা রকম ফাঁস এবং সে দেবদত্ত বীণা। মহারাজ শিকারী দলের সঙ্গে ভোর রাতে বেরিয়ে পড়লেন।

পিছনে পিছনে একদল বাছাই সৈন্য বলল যৌগন্ধরায়ণের নির্দেশে। স্বয়ং সেনাপতি রুমান্বনও চললেন সঙ্গে। তিনি অলক্ষ্যে থেকে খুব ভালভাবে নিরীক্ষণ করবেন। যদি তাঁর মনে হয় সে সত্যিই হাতীর পালের মধ্যে কোন সন্দেহজনক কিছু নেই, তবে ফিরে আসবেন তিনি।

প্রথম দিনেই হাতির পালের দেখা পেলেন উদয়ন। কিন্তু আশ্চর্য। তিনি বীণা হাতে নিলেই গজরাজ চিৎকার করে সংকেত দিতে থাকল। পালাতে থাকল হাতীর পাল। সারাদিন ছুটলেন তাদের পিছনে। একবারও তিনি তাদের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারলেন না।

সন্ধ্যায় রহস্যটা পরিষ্কার বোঝা গেল। সেনাপতি রুমান্বন এসে দেখা করলেন উদয়নের সঙ্গে। বললেন, এতক্ষণ আপনাকে অলক্ষ্যে অনুসরণ করেছি। এ ছিল মন্ত্রীর নির্দেশ। হাতীর পালে কোন ষড়যন্ত্র নেই। আমি নিশ্চিন্ত মনে বিদায় নিচ্ছি।

হাসলেন উদয়ন। বললেন, এতক্ষণে হাতির দলের পালাবার কারণ বুঝেছি। যৌগন্ধরায়ণের অতি সতর্কতায় আমাকে আজকের দিনটা বৃথা হয়রান হতে হ'ল। মন্ত্রীকে বলো, এজন্য তার তিরস্কার প্রাপ্য রইল।

পরদিন রুমান্বান চললেন রাজধানীর দিকে ফিরে আর উদয়ন ছুটলেন হাতীর পালের পিছনে। এক পদ্ম সরোবরে নেমেছে হাতীর পাল। শিকারীদের অপেক্ষা করতে বলে নিজের হাতি নিয়ে এগিয়ে চললেন উদয়ন। ঐ তো ওপারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গজরাজ। উদয়ন বীণা হাতে তুলে নিলেন। এবার গজরাজ ঘুরে দাঁড়াল তার দিকে।



উদয়ন বাদন শুরু করলেন। সে সুর সরোবরের ওপর দিয়ে বনের ভিতর দিয়ে একটা আকুল বেদনার মায়াজাল বিস্তার করে চলল। গজরাজ শুঁড় তুলে অভিবাদন করল তাকে। সরোবর থেকে হাতিরা তীরে উঠে হাঁটু গেড়ে বসল শিক্ষিত হাতির মত। আনন্দে উদয়ন নেমে পড়লেন হাতি থেকে। তার যাদু বীণার সুর-ঝঙ্কার কাজ করতে শুরু করেছে। এবার তিনি নির্ভয়। বাজাতে বাজাতেই তিনি যাবেন ঐ গজরাজের

কাছে। তার পিঠে উঠবে না। তারপর তাকে মন্ত্রমুগ্ধের মত চালিয়ে নিয়ে যাবেন কৌশাম্বীতে।

উদয়ন গজরাজের খুব কাছে এসে পড়েছেন। তার দেহের প্রতিটি ভাঁজ এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ···। গজরাজের চোখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন উদয়ন। এতো হাতির চোখ নয়। একি তবে মায়া হাতি! মহাসেনের লোকেদের বিজ্ঞানী কারিকুরি! সত্যিই কি তিনি তবে উজ্জয়িনী রাজের ফাঁদে পা দিয়েছেন! তাঁর বীণাবাদন থেমে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মায়া হাতির পেটের একটা অংশ দরজার মত খুলে গেল। অস্ত্র হাতে লাফিয়ে পড়ল জনাদশেক যোদ্ধা পুরুষ। পেছন থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল, পালাতে চেষ্টা করবেন না মহারাজ। এখন প্রকৃতপক্ষে আপনি আমাদের হাতে বন্দী।

উদয়ন ঘুরে দাঁড়ালেন। এক প্রৌঢ় এগিয়ে এলেন। তাঁকে আভুমি নত হয়ে অভিবাদন করে বললেন, আমি উজ্জয়িনীর মন্ত্রী বুদ্ধদত্ত। আমি স্বয়ং এসেছি মহারাজকে উজ্জয়িনীতে প্রত্যুদ্গমন করে এগিয়ে নিয়ে যেতে। আজ উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ দিন। ভারতের মহত্তম মানুষ আমাদের অতিথি হয়ে চলেছেন।

বলতে বলতে উদয়নের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চুপি চুপি বললেন, আপনার অসম্মান কোথাও হবে না মহারাজ। ছলনা করতে হ'ল বলে ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু জেনে রাখুন, আমি আপনার বন্ধু।

কোন কথাই বললেন না উদয়ন। অবস্থাদোষে বন্দী হয়েছেন। বিজেতাদের কথা শুনতেই হবে। ওদের কথা মত হাতীতে উঠে বসলেন। সেই মায়াহাতিতেই। সেটি আসল হাতির মতই চলতে থাকল যেতে যেতে বারম্বার তাঁর মনে হতে থাকল যৌগন্ধরায়ণের কথা। সে ঠিকই সন্দেহ করেছিল। উদয়ন স্বেচ্ছায়ই উজ্জয়িনীর দিকে পা বাড়িয়েছেন। রহস্য এতদিনে ভেদ হ'ল। কিন্তু উদ্ধার—দীর্ঘশ্বাস ফেললেন উদয়ন। তবু তাঁর মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটল। যৌগন্ধরায়ণ যখন আছেন, উদ্ধার তাকে করবেই।

যে শিকারীদের সরোবরের ওপারে দাঁড় করিয়ে রেখে চলে এসেছিলেন উদয়ন, তারা বিস্মিত আতঙ্কে উদয়নের বন্দী হওয়ার ঘটনা পুরোটাই দেখল এবং অসহায়ভাবে হাত কামড়াল। তাদেরও মনে হ'ল এতগুলি লোকের মধ্যে একমাত্র মন্ত্রীই সত্যটাকে ধরতে পেয়েছিলেন। সেনাপতি রুমান্বান যদি ফিরে না যেতেন! ওরা স্থির করল, এখন তাদের একমাত্র কাজ যত দ্রুত সম্ভব রাজধানীতে ফিরে গিয়ে মন্ত্রীকে সর্বনাশের সংবাদ দেওয়া।

এজন্য সবচেয়ে আগে ছুটে চলল উদয়নের নিজের হাতি। মাহুত গিয়ে সংবাদ দিল যৌগন্ধরায়ণকে। সেনাপতি নিজের মূর্খতায় হাত কামড়াতে থাকলেন। সংবাদটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল গোটা রাজ্যে। প্রজারা মহাসেনের শঠতায় এত ক্ষেপে গেল যে তারা বলতে থাকল, এখুনি চারদিক থেকে আক্রমণ কর উজ্জয়িনী। সৈন্যবাহিনী যদি আক্রমণ না করব, আমরা করব। আমরা আমাদের রাজাকে ফিরিয়ে আনব।

যৌগন্ধরায়ণ বহু কষ্টে থামালেন তাদের। বললেন, এখন উজ্জয়িনী আক্রমণ করা মূর্খতা। আমাদের রাজা তাদের হাতে বন্দী। আমরা রাজ্য আক্রমণ করলে, তারা যদি রাগে তাঁর কিছু ক্ষতি করেন!

প্রজারা এই যুক্তিতে থামলেও রুমান্বান শুধু এই যুক্তিতে থামলেন না। তিনি বললেন, আমরা একদিনে উজ্জয়িনী অধিকার করব। ওরা আত্মরক্ষার বাইরে আর কিছু ভাবতে পারবে না।

মন্ত্রী বললেন, মহাসেন যাই করুন, তাঁর অভিপ্রায় মন্দ নয়। তিনি চান মহারাজকে সম্মত করিয়ে কন্যা বাসবদত্তার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে তাকে মিত্ররূপে পেতে। এজন্যই তিনি মহারাজাকে বন্দী করেছেন। কন্যাকে গান শেখাবার নাম করে তিনি মহারাজকে সুযোগ দেবেন বাসবদত্তাকে দেখবার—গুণমুগ্ধ হবার। তা হ'লে আর এ বিয়েতে মহারাজের অমত থাকবে না। এখন বিয়ে দিয়ে মহারাজকে দেবেন মুক্তি।

রুমান্বান বললেন, এ অসম্মান! চূড়ান্ত অসম্মান। মহারাজকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে জোর করে বিয়ে দেওয়া। বিয়ের বদলে মুক্তি! আমরা জোর করে মহারাজকেও ছিনিয়ে আনব—ও কন্যাকেও আনব।

তারপর এখানে হবে বিয়ে আর এখান থেকে আমরা উজ্জয়িনীতে পাঠাব বিয়ের ভোজের নেমন্তন্ন।

মন্ত্রী বললেন, আমার ইচ্ছেটাও তাই। তাই আমি জোর করে ছিনিয়ে আনতে চাই না। ওরা যেমন কৌশলে বন্দী করেছে আমাদের মহারাজকে, তেমন আমরাও কৌশলেই মুক্ত করে আনব। ওদের মন্ত্রী বুদ্ধদত্ত যেমন এসেছিল মহারাজকে বন্দী করতে, তেমনি আমিও যাব তাঁকে মুক্ত করে আনতে।

রুমান্বান খুশিমনে অনুমোদন করল যৌগন্ধরায়ণের পরামর্শ। মন্ত্রীবর রাজ্যের সব দায় চাপিয়ে দিলেন সেনাপতির ওপর। তিনি বসন্তককে নিয়ে যাত্রা করলেন উজ্জয়িনীর উদ্দেশ্যে।

*　　*　　*　　*

গভীর রাত। অন্ধকার—বুঝি অমাবস্যাই হবে। উজ্জয়িনীর কাছেই এক মহাশ্মশানে এলেন যৌগন্ধরায়ণ। এত বড় শ্মশান বুঝি আর নেই। কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে এখানে ওখানে চিতা জ্বলছে। চিতার লাল আলোতে দাহকারীদের দেখাচ্ছে এক একটা রাক্ষসের মত। থেকে থেকে শেয়ালেরা বা কুকুরগুলো হু-উ-উ করে ডেকে উঠছে। যেন পৃথিবীর বুকফাটা কান্না।

বসন্তক বললে, এ কোথায় এলেন মন্ত্রী মশাই। আমার যে ভয়ে গা ছম্ ছম্ করছে। অত এগিয়ে যাবেন না।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, এই হচ্ছে উজ্জয়িনীর মহাশ্মশান এখানে ব্রহ্ম রাক্ষস নামে এক যোগী পুরুষ থাকেন। আমরা তার কাছে যাচ্ছি।

বসন্তক বললেন, এমন জায়গায় যে লোক থাকে, সে লোক ভাল নয়। চলুন আমরা অন্যত্র যাই। এখানে নয়।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, আমরাও তো এখন লোক ভালো নই। আমরা চোরের মত প্রাচীর ডিঙ্গাব, যাদুকরের মত রূপ বদলাব, অহরহ মিথ্যা কথা বলব! আমরা যে ষড়যন্ত্র করতে চলেছি।

বসন্তক বলল, ও বাবা! আপনাকে তো মহৎলোক বলে জানতাম। আপনিও এসব করেন না কি?

যৌগন্ধরায়ণ হাসলেন। বললেন, ব্রাহ্মণ, রাজনীতি বড় জটিল। যারা যত বড় রাজনীতিবিদ্ তারা তত ধড়িবাজ—তত শয়তান।

বলতে বলতে তারা শ্মশানের মধ্যে এক গাছতলায় এক কুটিরের কাছে চলে এলেন। এক সঙ্গে গোটা দশেক কুকুর ডেকে উঠল। যৌগন্ধরায়ণ বলে উঠলেন, শিবঃ শিবঃ শিবঃ।

ঘরের ভেতর থেকে উত্তর এলো, কে! যৌগন্ধরায়ণ! মন্ত্রীবর। দরজা খুলে গেল। জটাজুট ধারা এক ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। প্রদীপ তুলে যৌগন্ধরায়ণকে দেখে বললেন, আপনি! এত রাতে!

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, তোমার কাছে গোপনে এসেছি। তাই রাত্রে আসতে হ'ল ব্রহ্মরাক্ষস।

এই বলে তিনি ব্রহ্মরাক্ষসকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তাকে সব খুলে বললেন। ব্রহ্মরাক্ষস বল্‌ল, উজ্জয়িনীতে তো আপনার এ বেশে যাওয়া চলে না।

মন্ত্রী বল্‌লেন, জানি। তাই তো তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমাদের চেহারা বেশ—সবই পরিবর্তিত করে দাও।

ব্রহ্মরাক্ষস সারারাত ধরে ওদের চেহারা এমনভাবে দেখে দিল যে, একে অন্যেকে চিনতে পারলেন না। মন্ত্রী হলেন এক কুঁজো ব্রাহ্মণ আর বসন্তক হ'ল এক কুৎসিত-দর্শন যুবক। দু'জনে যখন উজ্জয়িনীর পথ দিয়ে যেতে থাকলেন, তখন পথের সব লোকই হাঁ হয়ে তাদের দেখতে থাকলেন। এ আজব জীব দুটি এলো কোথা থেকে! এ হ'ল তাদের প্রশ্ন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও পেল তারা। যত আজব জিনিস তো উজ্জয়িনীতে এসে জোটে।

যৌগন্ধরায়ণ সময় ব্যয় না করে রাজপুরীর দরজায় এসে থামলেন। প্রহরীরা আটকাল। যৌগন্ধর বললেন, আমরা নানা মজার কসরৎ দেখাই। রাজপুরীতে সকলকে আমোদ দিয়ে দুটো ভিক্ষে নিতে চাই।

প্রহরীরা হাসল। একজন বল্‌ল, তোমাদের আর কসরৎ দেখাতে হবে না। যা রূপ! ও দেখলে যে কেউ আপনা থেকেই হাসবে। যাও রাজকুমারীরা খুব মজা পাবে।

প্রায় বিনা বাধাতেই রাজপুরীতে ঢুকলেন যৌগন্ধরায়ণ। সেখানে এক চত্তরে দাঁড়িয়ে সত্যিই নানা উদ্ভট কসরৎ এবং অঙ্গভঙ্গি দেখাতে থাকলেন দুজনে মিলে। রাজ অন্তঃপুরের সকলেই খুব খুশি। ওরা সবাই এখানে ওখানে টেনে নিয়ে গিয়ে ওদের খেলা দেখতে থাকলেন। এই মজার সংবাদ সঙ্গীতশালায় বাসবদত্তার কানে গিয়েও পৌঁছাল। তিনি ভাবলেন, বন্দী রাজপুত্র হয়ত ওদের খেলা দেখে খুশী হবেন। তিনি ওদের সঙ্গীতশালায় নিয়ে আসতে বললেন, এক সখি ছুট্‌ল তাদের ডেকে আনতে।

এই অবসরে আমরা বন্দী উদয়নের কথা জেনে নিতে পারি। বুদ্ধদত্ত সত্যিই সমাদর করে উদয়নকে রাজধানীতে নিয়ে এলেন। তাঁকে মনোরম সঙ্গীত ভবনে নিয়ে আসা হ'ল। উদয়ন অত বাদ্যযন্ত্র সমন্বিত সুন্দর সঙ্গীতশালা দেখে মনে মনে খুশীই হ'লেন। সেখানে তাঁকে সসম্মানে উচ্চ সিংহাসনে বসান হ'ল। এরপর এলেন স্বয়ং মহাসেন। অলঙ্কার-শূন্য সাধারণ বেশ। যুক্ত করে অভিবাদন করলেন তিনি। বললেন, বৎসরাজ উদয়ন। আপনার সঙ্গে ছলনা করেছে এ জন্য আমি লজ্জিত। আমার অভিমানিনী কন্যার জন্যই আমাকে এত কিছু করতে হয়েছে। সে আপনার গুণমুগ্ধ। আপনার কাছেই সে সঙ্গীতবিদ্যা শিখতে চায়। আপনি অনুগ্রহ করে তাকে শিষ্যত্বে বরণ করুন।

উদয়ন বললেন, বন্দীর কাছে এত বিনয় কেন! আদেশ করুণ!

মহাসেন কি যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বাসবদত্তা ঢুকলেন সেখানে। ধীরপায়ে এগিয়ে এসে বললেন, আমি অবিবাহিতা কন্যা। আমার পক্ষে তো কৌশাম্বীতে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বাবা! যা কিছু হয়েছে সব—সব আমার জন্য। আপনি আমাকে মার্জনা করুন।

বাসবদত্তার অসামান্য রূপ আগেই উদয়নের মনকে কোমল করে এনেছিল। তারপর তার ঐ বিনয়নম্র আচরণ উদয়নের মনের সব বিরূপতা দূর করে দিল। উদয়ন বললেন, আমি আপনাকে সঙ্গীত শেখাব দেবী!

সেই থেকে বাসবদত্তা উদয়নের কাছে সঙ্গীত শিখতে লাগলেন। তার সেবার সবভার নিলেন নিজে। মহাসেন খুশিমনে এ সব ব্যবস্থা মেনে নিলেন। উদয়নের মন যতই নরম হতে থাকল, মহাসেন ততই আনন্দিত হতে থাকলেন কিন্তু বাসবদত্তার মন ততই বাবার ওপর বিরূপ হতে থাকল। সে না হয় চেয়েই ছিল বৎসরাজের কাছে গান শিখেতে— তাই বলে তাঁকে বন্দী করে এনে! নিষ্ঠুর।

মহাসেন এবারে উদয়নের সঙ্গে বাসবদত্তার বিয়ে দিয়ে উদয়নকে মুক্তি দেওয়ার কথা ভাবছিলেন। এ কথা বাসবদত্তার কানেও এসেছিল। উদয়নের মত মানুষকে স্বামী হিসাবে পেতে বাসবদত্তার কোথাও আপত্তি ছিল না—বরং আনন্দই ছিল। কিন্তু বন্দী অবস্থায় বৎসরাজকে বিয়ে দেওয়া হবে, এতে মনে মনে বাসবদত্তার ছিল প্রবল আপত্তি। কেন, কেন তাঁকে এমন অসম্মানের মাঝে বিয়ে করতে হবে! এ বাবার ভীষণ অন্যায়! কিন্তু কি ভাবেই বা প্রতিবাদ করবে বাসবদত্তা।

এমন সব চিন্তা যে উদয়নের মাথাতেও না ছিল তা নয়। বাসদত্তাকে বিয়ে করতে তাঁর আপত্তি কেথায়। এমন স্ত্রী তো রত্ন। কিন্তু যদি তাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়া যেত কৌশাম্বীতে বিয়েটা সেখানে হ'ত। কিন্তু সে কি আর হবে! সত্যিই কি পারবে যৌগন্ধরায়ণ তাকে মুক্ত করতে! তাকে একাকী নির্জনে বন্দী করেছেন উজ্জয়িনী রাজা। কিন্তু তাকে মুক্ত করতে হবে উজ্জয়িনী রাজের চোখের সামনে থেকে। তা কি সম্ভব হবে! এ সব কথা ভাবলেই গম্ভীর হয়ে যেত উদয়নের মুখ। তিনি বিষণ্ণ হয়ে উঠতেন।

এই বিষণ্ণ মুখে হাসি ফোটান গেলেও যেতে পারে ভেবে বাসবদত্তা আমুদে কুঁজো বুড়োকে সঙ্গীতশালায় ডেকে আনতে বলেছিলেন। সখিটি তাকে ডেকে নিয়েই আসছিল।

সখির ডাকে যৌগন্ধরায়ণ একাই গেলেন। বসন্তক রইল বাইরে। যদি যৌগন্ধরায়ণ ফিরে আসতে না পারেন তবে কি করতে হবে, তার নির্দেশ রইল তার কাছে। বসন্তক নিজের চাতুর্য দিয়ে সকলকে আকৃষ্ট করে রাখল।

সঙ্গীত শালায় ঢুকেই মহারাজের সাক্ষাৎ পাবেন একথা মন্ত্রী আগে ভাবেননি। তিনি সবটা দেখে অবস্থাটা বুঝে নিলেন! আপাতভাবে সঙ্গীতশালায় উদয়ন মুক্ত আছেন মনে হলেও এ যে নতুন কৌশলে নির্মিত বন্দীশালা—তা তিনি বুঝলেন। এও বুঝলেন যে বাসবদত্তা এখন অনুতপ্ত। তিনিই যে উদয়নের বন্দীত্বের জন্য দায়ী এ কথা ভেবে তার বেদনার শেষ নেই। এখন তিনি পারলে উদয়নকে মুক্তি দিতেন। মহারাজ উদয়নের মনোভাব বুঝতেও তাঁর দেরী হ'ল না। তিনি বাসবত্তার দিকে ফিরে বললেন, দেবী আমাকে আহ্বান করেছেন!

বলেই পিছন ফিরলেন বৃদ্ধ। যেন কোন অঙ্গ-ভঙ্গি করছেন। কিন্তু তারই মধ্যে মহারাজাকে ইঙ্গিত দিলেন। উদয়ন বুঝলেন যে ঐ বৃদ্ধ আর কেউ নয় মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ। আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠ্‌ল তাঁর মুখ।

বাসবদত্তা তা দেখে ভাবলেন যে বৃদ্ধের আমোদে খুশী হয়েছেন উদয়ন। তিনি বৃদ্ধের প্রতি আরও প্রসন্ন হয়ে উঠলেন। বললেন, বৃদ্ধের আমোদ বড় আনন্দদায়ক, না মহারাজ।

উদয়ন বললেন, হ্যাঁ। আমি খুব খুশী হয়েছি। বাসবদত্তা! ওর এক সঙ্গী বাইরে অপেক্ষা করছে। আমাদের আজকের সরস্বতী পূজার অর্ঘ্য তাকে দান কর।

বাসবদত্তা খুশীতে সেদিনের অর্ঘ্য বৃদ্ধের সঙ্গী অর্থাৎ বসন্তককে নিতে ছুটল। সেই সুযোগে যৌগন্ধরায়ণ বললেন, মহারাজ! বাসবদত্তা আপনার গুণমুগ্ধা। তাই সে আপনার বন্দীত্বে নিজের পিতার ওপরেও বিরূপ। আপনার পলায়নের ব্যাপারে তাকে কাজে লাগাতে হবে। আপনি কি এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন?

উদয়ন বললেন, হ্যাঁ করি। বাসবদত্তা আমার জন্য মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত, তা আমি জানি। কিন্তু কিভাবে তাকে কাজে লাগাবে?

মন্ত্রী বললেন, সে আমি বুঝব মহারাজ!

আর কোন কথা হবার আগেই বাসবদত্তা ফিরে এলেন। যৌগন্ধরায়ণ হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, কৌশাম্বীর মহারাণীর জয় হোক!

শুনে বাসবদত্তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। কে লোকটা? সে যে মনে মনে কৌশাম্বীর রাণী হতে প্রস্তুত, তা কি করে জানল লোকটা? লোকটা বল্‌ল, আমি কৌশাম্বীর মহামন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ। আমি আপনাকে কৌশাম্বীর রাণী পদে নির্বাচন ও বরণ করলাম দেবী!

গম্ভীর মুখে বাসবদত্তা বললেন, আমি আপনার নির্বাচনকে, মান্য এবং বরণ করাকে শিরোধার্য করলাম মন্ত্রীবর।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, তবে আপনি এখন কৌশাম্বীর দলে। আমরা সকলের অজান্তে আপনাকে সহ মহারাজকে কৌশাম্বীতে নিয়ে যেতে চাই।

বাসবদত্তা বললেন কি ভাবে?

যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তাকে মৃদু স্বরে কি সব বললেন। তারপর মহারাজও শুনতে পান এমন স্বরে বললেন, তা হ'লে আজ থেকে তৃতীয় দিনের রাত্রি দ্বিপ্রহরই চূড়ান্ত সময় ধার্য রইল।

বাসবদত্তা ঘাড় নত করলেন।

* * *

যৌগন্ধরায়ণ এ তিন দিন বসে রইলেন না। উজ্জয়িনীর কাছেই বিন্ধ্যারণ্যের ধারে এক দল উপজাতীয় মানুষ বাস করতো। তাদের বলা হ'ত পুলিন্দ। তাদের রাজার নাম ছিল পুলিন্দক। পুলিন্দক ছিলেন মহারাজ উদয়নের বন্ধু। আর কাছে এলেন যৌগন্ধরায়ণ। জানালেন তার পরিকল্পনার কথা। বললেন, মহারাজ পালিয়ে প্রথম এখানে আসবেন। বলা যায় না, তাঁকে মহাসেন বা তার পুত্রেরা সসৈন্যে পশ্চাদ্ধাবন করতে পারেন। যদি করেন, তবে তাদের বাধা দেবার দায় আপনার। এ জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

পুলিন্দক বললেন, থাকব।

এ আয়োজন করে তিনি ছুটলেন আবার মহাশ্মশানে ব্রহ্মরাক্ষসের কাছে।

এদিকে রাজকন্যা বাসবদত্তার হঠাৎ শখ জেগে উঠল হাতিতে চড়ার। মহাসেন তাঁকে একটি অল্পবয়স্ক হাতি উপহার দিয়েছিলেন। সেটি চড়ে

ঘুরতে থাকলেন তিনি। সেটি চড়ে মন্দিরে যান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে যান, এমন কি নিজ আবাস থেকে সঙ্গীতশালায় আসতেও হাতি ব্যবহার করতে থাকলেন।

গোপালক বাবাকে বললেন, বাসবদত্তার শখ দেখেছেন মহারাজ!

মহাসেন হো হো করে হাসলেন। বললেন, শখ মিটিয়ে নিক। শ্বশুরবাড়ি গেলে তো আর এ সব চলবে না!

নির্দিষ্ট দিনে রাতে দ্বিপ্রহরের আগে থেকেই হাতিটি অপেক্ষা করতে থাকত সঙ্গীতশালার দ্বারের কাছেই অন্ধকারে। অন্ধকারে কার হাত ধরে রাজকুমারী বেরিয়ে এলেন ঠিক বোঝা গেল না। রাজকুমারীকে নিয়ে সে আর তত মাথাও ঘামাল না। স্বয়ং উদয়ন বাসবদত্তার হাত ধরে হাতিতে উঠলেন। দেখা গেল বসন্তক এবং বাসবদত্তার এক সখি আগে থেকেই হাতিতে উঠে বসে আছে।

হাতি চলতে শুরু করল। রাজপুরী থেকে বের হবার একটি দরজা আগে থেকেই খুলে রাখবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যৌগন্ধরায়ণ। প্রহরীরা দূরে সরে গেছিল। সেখান দিয়ে হাতি বের করে নিতে গিয়ে হাওদা আটকে গেল। এর ফলে সময় নষ্টও হ'ল, একটু শব্দও হয়ে গেল। তা শুনে বীরবাহু এবং তালভট্ট নামে দুই প্রহরী ছুটে এলো। নিরুপায় হয়ে বৎসরাজ উদয়ন তাদের তলোয়ার দিয়ে ছিন্ন করলেন। হাতি প্রাচীর অতিক্রম করে বিন্ধ্যারণ্যের দিকে ছুটল।

এদিকে বীরবাহু এবং তালভট্ট মরবার আগে যে চিৎকার চেঁচামেচি করে তাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় রাজপুত্র গোপালকের। তিনি প্রহরীকে পাঠান গোলমালের কারণ জানতে। সে ছুটে এসে বলল, যুবরাজ সর্বনাশ হয়েছে। বৎসরাজ পালিয়েছেন। রাজকন্যাকেও জোর করে নিয়ে গেছেন। বীরবাহু এবং তালভট্ট বাধা দিতে গিয়ে আহত হয়েছে।

কি! রাজকন্যাকে অপহরণ! বন্দীকে আদরযত্ন আদৌ ভাল লাগত না গোপালকের। বাবার এসব রাজনীতি সমর্থন করতে পারতেন না গোপালক। তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বাবার ঐ নীতির ফলেই এ সব ঘটেছে। এখন লোক সমাজে মুখ দেখান যাবে কিভাবে!

তিনি কালবিলম্ব না করে নিজস্ব সেনাদল নিয়ে ছুটলেন ওদের পিছনে। যুবরাজ গোপালক তাঁর একান্ত অনুচর ও বিদূষককে সব অবস্থা বাবাকে জানিয়ে আরও সৈন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বলে গেলেন।

বাসবদত্তা উদয়ন, বসন্তক এবং সেই সখিটিকে নিয়ে বাসবদত্তার হাতি যখন প্রায় পুলিন্দকের রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, ঠিক সেই সময় গোপালকের সৈন্যদল গিয়ে ঘিরে ফেলল ঐ হাতিকে। গোপালক বললেন, দুর্বিনীত বৎসরাজ! বন্দীকেও সমাদরে সসম্মানে রাখা হয়েছিল, এই তার প্রতিদান!

বৎসরাজ হাসলেন, বললেন, দুর্বিনীত আমি বটেই। কিন্তু সেই সঙ্গে ক্ষত্রিয়ও বটে। ক্ষত্রিয় কন্যা হরণ করেই বিবাহ করে। আমি বাসবদত্তাকে বিয়ে করব।

গোপালক বললেন, বটে! বিয়ে করে আমাদের মুখ হাসাবে! সে সব চলবে না। নেমে এসো। আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। যদি আমাকে পরাজিত করতে পার, তবে বাসবদত্তাকে নিয়ে যাবে, নতুবা আমি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

ততক্ষণে পুলিন্দকের সৈন্যদলও এসে গেছে। প্রায় এক যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা। একদিকে উদয়ন অন্যদিকে গোপালক। যুদ্ধ শুরু হয় আর কি! এমন সময় নেমে এসে মাঝে দাঁড়ালেন বাসবদত্তা। বললেন, দাদা! এ যুদ্ধ হতে পারে না। আমি স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করে এসেছি। আমি ফিরে যাব না।

গোপালক চোখ পাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, কি! কি বললি মুখপুড়ী!

উত্তরে বাসবদত্তা কি বলতে গেলেন, তা বহু অশ্বের ছুটে আসার শব্দে শোনা গেল না। সেখানে এসে পৌঁছালেন মহাসেনের দ্বিতীয় পুত্র পালক। তিনি এসেই চিৎকার করে উঠলেন, দাদা, দাদা, থাম!

কেন?

এই শোন মহারাজের আদেশ! এই বলে তিনি এক পত্র বৎসরাজের হাতে তুলে দিলেন। বললেন, আপনারা পালিয়েছেন সংবাদ দিতেই

মহারাজ খুব হাসতে শুরু করলেন। এবং এই পত্র আমার হাতে দিয়ে বললেন, শিঘ্র তুমি যাও। গোপালককে প্রতিনিবৃত্ত কর। আর ঐ পত্র বৎসরাজের হাতে দিয়ে বলেন, তিনি বাসবদত্তাকে নিয়ে পালায়ন করায় আমি খুবই খুশি হয়েছি। কারণ সবটাই হয়েছে তাঁর পরিকল্পনা মত। তিনি সবই জানতেন। মাঝ থেকে বীরবাহু আর তালভট্টই কিছুটা বেতালা করেছিল। আর করেছিল গোপালক।

পত্র খুললেন বৎসরাজ। দেখলেন লেখা আছে—

পরম কল্যাণবরেষু,

বাবাজীবন! তুমি বাসবকে লইয়া যাওয়ায় যারপরনাই খুশী হইয়াছি। তুমি বা তোমার মন্ত্রী আদৌ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পার নাই। আমি সবই জানতাম। বরং তোমরা আমারই পরিকল্পনা মত কাজ করিয়াছ।

কৌশাম্বীতে পেঁছায়াই বাসবকে বিবাহের আয়োজন করিও। আমি স্বয়ং গিয়া তাহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব। ইহার পর তোমাকে শুধু বাসবকে নয় তাহার বড় ভাই গোঁয়ার গোপালককেও সামলাইতে হইবে।

আশীর্বাদ করি তোমার সর্ব মঙ্গল হোক। ইতি।

আশীর্বাদক

শ্রীমন মহারাজ চণ্ড মহাসেন।

পত্র পাঠ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল উদয়নের মুখ। তিনি পত্রটি গোপালকের হাতে দিলেন। গোপালকের মুখ রাঙা হয়ে উঠল। তিনি বললেন, এ বাবার অন্যায়। তিনি ষড়যন্ত্র করে আমাকে সকলের কাছে হেয় করলেন। বলে অকৃত্রিম আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন উদয়নকে।

একপাশে দাঁড়িয়ে পুলিন্দক আনন্দে হাসতে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়নের দিকে তাকিয়েই থমকে গেলেন। বললেন, কি মন্ত্রী মশাই! এই আনন্দের মুহূর্তে আপনার মুখ অত গম্ভীর কেন?

মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বললেন, ভাবছি পুলিন্দরাজ, ভাবছি! দুই রাজার এক এক রাজকন্যাকে সামনে রেখে দুই রাজ্যের দুই মন্ত্রীতে এই যে বুদ্ধির খেলা হল, তাতে আমি হেরেছি না জিতেছি!

পুলিন্দক বললেন, কি বুঝলেন?

যৌগন্ধনারায়ণ বললেন, বোধহয় হেরেছি। কিন্তু এতবড় গৌরবের হার আর কি কখনও হারতে পারব পুলিন্দরাজ!



দুই রাণী আর দুই রাজপুত্রের কথা

ইরাবতী নগরে এক রাজা বাস করতেন। বিচিত্র ছিল তাঁর নাম পরিত্যাগসেন। রাজার দুই রাণী। প্রথমা রাণীর নাম মনোরমা আর দ্বিতীয়া রাণীর নাম কাব্যালঙ্কারা। প্রথমা রাণী ছিলেন এক রাজ্যের মন্ত্রীর কন্যা আর দ্বিতীয়া ছিলেন এক রাজপুত্রী। এজন্য প্রথমা রাণী মনে মনে দ্বিতীয়া রাণীকে ঈর্ষা করতেন।

কোন রাণীরই কোন পুত্র-কন্যা ছিল না। ফলে রাজার মনে ছিল বেজায় দুঃখ। রাজা প্রতিদিন দুর্গাপূজা করতেন আর বলতেন, মা, তুমি সকল মানুষের দুর্গতি নাশ কর আর আমার এ দুর্গতির দিকে তোমার নজর নেই কেন? আমি তোমার ভক্ত নই কি, মা!

একদিন রাজার দুঃখ চরমে উঠল। রাজপ্রাসাদে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি যেন শুনলেন, পাশের পথে যেতে যেতে কে বলছে, তাড়াতাড়ি চল

ভাই, তাড়াতাড়ি রাজবাড়ি পার হয়ে চল। আটকুঁড়ো রাজার মুখ দেখলে অযাত্রা!

ঘুম ভেঙে গেল রাজার। সত্যিই কি কেউ এ কথা বলেছে! রাজবাড়ীর অত কাছে পথ কোথায়? যেখানে পথ সেখান থেকে বললে রাজার কানে আসবার কথা নয়। তবে কি স্বপ্ন!

স্বপ্ন হোক, বাস্তব হোক, রাজার মন দুঃখে ভরে গেল। তিনি দুর্গার মন্দিরে গিয়ে দেবীর পা স্পর্শ করে শুয়ে পড়লেন, বললেন—মা, হয় পুত্র দাও নয় আমার জীবন নাও। বলে উঠলেন না রাজা। পড়েই রইলেন।

একদিন গেল, দু দিন গেল রাজা না করেন আহার না করেন পান। নির্জলা উপবাস। দিবারাত্র এক কথা—মা, হয় পুত্র দাও, নয় প্রাণ নাও।

তৃতীয় দিনও কেটে গেল। ঐ রাতে রাজার দুচোখ জুড়ে নামল ঘুম। ঘুমের মধ্যে দেখলেন দশ হাতে দশ রকম অস্ত্র নিয়ে সিংহ থেকে নেমে এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন দেবী দুর্গা। বলছেন, ওঠ্ বাছা। এই নে দুটি ফল। দুই রাণীকে দিস্। দুটি পুত্র হবে। তোর সব দুঃখ দূর হবে। রাজা হাতপেতে ফল দু'টি নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিন্তু রাজা বিস্মিত হয়ে দেখলেন, তার দুই হাতে দুটি ফল রয়েছে। তা হলে তো দেবীর নির্দেশ মিথ্যা নয়। রাজা ছুটলেন প্রাসাদে। রাণীদের বললেন তাঁর স্বপ্নাদেশের কথা। রাণীরা ফল দু'টি চাইলেন। রাজা বললেন ধৈর্য্য ধর। যথা সময়ে দেব।

সেদিন রাত্রে মনোরমার ঘরে থাকার পালা। সন্ধ্যায় রাজা, স্নান করে পবিত্র পোশাক পরে গেলেন মনোরমার ঘরে। পরিচারিকাদের সঙ্গে মনোরমা রাজাকে দরজা থেকেই অভ্যর্থনা করে নিলেন। রাজা তাকে স্নান করে পট্টবস্ত্র পরে আসতে বললেন। মনোরমা তেমনি ভাবে এলে রাজা একটি ফল দিয়ে বললেন, খেয়ে নাও।

রাত্রে দ্বিতীয় ফলটি মাথার কাছে রেখে শুলেন। মন্ত্রীকন্যা গভীর রাত্রে উঠে দ্বিতীয় ফলটিও খেয়ে নিলেন।

ভোরে উঠে রাজা দেখলেন ফলটি নেই। মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ফল কোথায়?

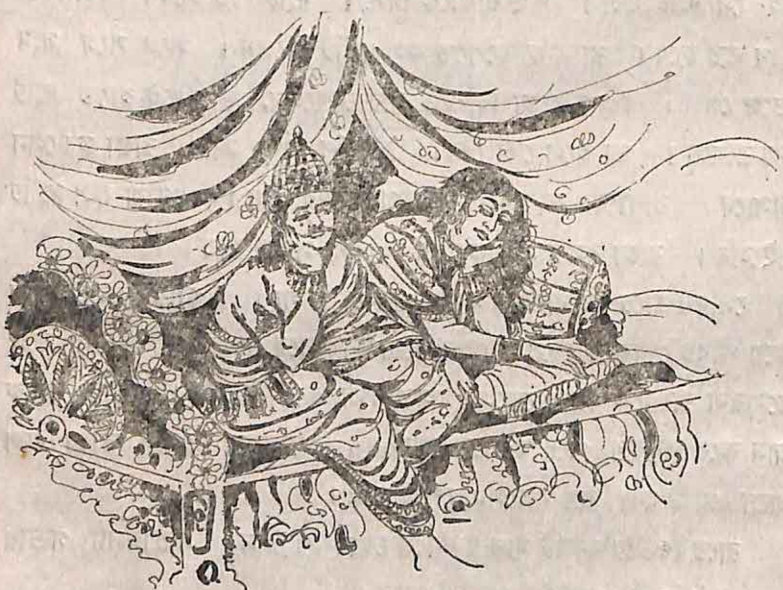
হেসে মনোরমা বললেন, অমন মধুর ফল। মাথার কাছে অরক্ষিত রয়েছে দেখে আমি খেয়ে নিয়েছি। আমার দোষ নিও না রাজা।

রাজা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। হায়, হায়! একি হ'ল তার! মনোরমা যে এ শঠতা করতে পারে, এটুকু তিনি অনুমান করতে পারলেন না! এখন কাব্যালঙ্কারাকে কি বলবেন! রাগে তার গা জ্বলতে থাকল। অথচ মনোরমাকে তিনি শাস্তি দিতেও পারলেন না।

সেদিন রাতে কাব্যালঙ্কারা সমাদরে আপ্যায়ন করলেন রাজাকে। কিন্তু বিষাদমূর্তি! কি করে কি ভাবে তিনি দুঃসংবাদটি দেবেন কাব্যালঙ্কারাকে!

রাণী লক্ষ্য করলেন রাজার এ অন্যমনস্কতা। বললেন, মহারাজ! আপনার মন বিষণ্ন কেন?

রাজা প্রায় কেঁদে ফেললেন। বললেন, মনোরমা আমার অজ্ঞাতে দুটি ফলই খেয়ে ফেলেছে। তোমার জন্য কোন ফলই নেই।



শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রাণী। বললেন, মহারাজ! আজ আপনার দিকে তাকিয়ে না হয় নিজের মনকে শান্ত করলাম কিন্তু সারা জীবন?

মনোরমার ছেলে হবে, তার সমাদর বাড়বে, ছেলেরা বড় হবে, আর আমাকে সেদিন কে মর্যাদা দেবে মহারাজ! সে যে আমাকে বঞ্চিত করে, আমারই সন্তান চুরি করে নিয়েছে, সে কথা কে মনে রাখবে মহারাজ! সেদিন আমার মন যদি ঈর্ষায় মেতে ওঠে তবে আমাকে কে ক্ষমা করবে? বলুন মহারাজ! বলুন!

রাজা বললেন, চুপ কর রাণী! চুপ কর। তোমার তিরস্কার আমি সইতে পারছি না। যা হবার তা হবে। দেখছি আমার ক্ষেত্রে ভাগ্যই বড়।

রাণী বললেন, মহারাজ! আপনি মনোরমার এ শঠতার কোন প্রতিবিধান করলেন না। আমি প্রাণ দিয়ে এর শোধ নেব।

রাজা বললেন, শান্ত হও রাণী, শান্ত হও।

* * *

শান্ত হতেই চেষ্টা করলেন কাব্যালঙ্কারা। রাজাও প্রথম দিকে তাঁর প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে থাকলেন, কিন্তু যখন মনোরমার যমজ পুত্র জন্মাল, তখন সমস্ত রাজপুরীই মেতে উঠল তাদের নিয়ে। মনোরমা রইল তাদের মাঝখানে। ভুলেও কেউ কাব্যালঙ্কারাকে ডাকল না—আনন্দের আতিশয্যে রাজা নিজেও কাব্যালঙ্কারাকে উৎসবে ডেকে আনতে ভুলে গেলেন।

ছেলে দু'টি হ'ল ভারী সুন্দর। বড়টির চোখ দুটি যেন পদ্মফুল। তাই তার নাম রাখা হ'ল ইন্দীবরসেন। দ্বিতীয়টির নামকরণে রাজা তাঁর মনের কথাটুকু প্রকাশ করে দিতে চাইলেন। এ ছেলেটি তো মনোরমার না হয়ে কাব্যালঙ্কারার হ'ক এই ত' ছিল দেবীর ইচ্ছা। তাই তার নাম রাখলেন, অনিচ্ছাসেন।

ছেলে দু'টিকে দেখে কার না আদর করতে ইচ্ছে করে! কাব্যালঙ্কারা আদর করতে গেলেন তাদের। মনোরমার বাপের বাড়ির ঝি এসে কেড়ে নিল ওদের। বলল, সৎমায়ের আদর না ডাইনীর ছোবল। তুমি বাপু ছুঁয়ো না ওদের। অমঙ্গল হবে।

রাণী কাব্যালঙ্কারা নিজের ঘরে এসে লুটিয়ে কাঁদলেন। মহারাজকে

বললেন, আমাকে বিষ দিন মহারাজ। মেরে ফেলুন। এ তিল তিল যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারি না।

রাজা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করতে চাইলেন, কিন্তু মনোরমার দাসীকে কিছুই বললেন না। কাব্যালঙ্কারার বুকের আগুন তাতে আরও জ্বলল। নিভল না এতটুকু।

ছেলেরা বড় হ'ল। রূপে গুণে অতুলনীয়। নানা বিদ্যায় পারদর্শী হ'ল তারা। বছর কুড়ি বয়স হ'লে, দুজনেই বললে, বাবা, আমরা দিগ্বিজয়ে যাব।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল। যাত্রার আগে দু'জনে রাজপুরীর সকলকেই জিজ্ঞাসা করল দিগ্বিজয় থেকে ফিরবার সময় কার জন্য কি আনতে হবে। সকলেই পছন্দমত ফরমাস দিল। কিন্তু ইন্দীবর বা অনিচ্ছা, কেউই কিছু জিজ্ঞাসা করল না কাব্যালঙ্কারাকে। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন বের হতে থাকল।

যাত্রার আগে রাজা দুই পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, তোমরা দেবী দুর্গার আশীর্বাদে জন্মেছ। অতএব যখনই কোন বিপদে পড়বে তখনই দুর্গার স্তব করবে। দুই পুত্রকে দুর্গার স্তব শিখিয়ে দিলেন রাজা।

*　　*　　*

রাজপুত্রেরা প্রথমে গেলেন পূর্ব দিকে। সেই সব বিজিত রাজ্যের রাজাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়ে তাদেরই ফিরিয়ে দিলেন রাজ্য। নিয়মিত কর পাঠাবার ব্যবস্থা হ'ল। সেই সব রাজ্যের সৈন্য নিয়ে বিশাল বাহিনী গঠিত হ'ল। সেই দল চলল দক্ষিণ দেশ বিজয়ে।

রাজপুত্রদের বিজয় কাহিনী যতই এসে পৌঁছাতে লাগল ইরাবতী নগরে, ততই মনোরমা এবং রাজা নানা ধরনের উৎসব এবং প্রমোদের আয়োজন করতে থাকলেন। এ সব উৎসবে প্রমোদে যে কাব্যালঙ্কারাকেও ডাকা যেতে পারে বা ডাকা উচিত তা ভুলে গেলেন রাজা। কাব্যালঙ্কারা দাঁতে দাঁত চেপে স্থির করলেন এর শোধ নিতেই হবে। কিন্তু কিভাবে?

অবশেষে তাঁর মনে পড়ল যে এক সময় রাজ্যের বিদেশমন্ত্রীকে

রাজার রোষ থেকে রক্ষা করেছিলেন তিনি। বিদেশমন্ত্রী সেই থেকে তাঁর অনুগত। তাঁকে ডাকলেন। বললেন, আমি তোমার সাহায্য চাই।

আদেশ করুন। বিদেশমন্ত্রী বললেন।

কাব্যালঙ্কারা তাঁর গোপন ইচ্ছা তাঁর কানে কানে বললেন। বিদেশ-মন্ত্রী শিউরে উঠলেন। তিনি বললেল, দেবী! আপনি আদেশ করলে আমি প্রাণপণে তা করব। কিন্তু আপনি আবার ভাবুন। এ ষড়যন্ত্র ফাঁস হবেই। আর তখন আপনার বা আমার অবস্থা কি হবে!

রাণী বললেন, ধরা পড়লে রাজা হত্যা করবেন আমাকে। আমি তাই চাই। আপনি আমার ইচ্ছা পূরণের ব্যবস্থা করুন।

বিদেশমন্ত্রী বললেন, তাই হবে দেবী।

* * *

তখন স্কন্দাবারে ছিল রাজপুত্রেরা। মস্ত বড় এলাকাজুড়ে শিবির। চারদিক থেকে সামন্তেরা এসেছেন রাজপুত্রদের অভ্যর্থনা জানাতে। আরও বড় আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তারা। রোজই সামন্তদের সঙ্গে রাজপুত্রদের আলোচনা সভা বসছে। এমন সময় পরিত্যাগসেনের কাছ থেকে এক গোপন চিঠি এলো সামন্তদের কাছে। সামন্তপ্রধান পত্র পড়ে চমকে উঠলেন। জালপত্র নয় তো! কিন্তু না। স্বাক্ষর তো চেনা! তিনি সমস্ত সামন্তদের নিয়ে সভা ডাকলেন। সেখানে পড়ে শোনালেন পত্রটি। সব সামন্তই সে পত্র শুনে চমকে উঠলেন। কিন্তু স্বাক্ষর তো সকলেরই চেনা। অতএব স্থির হ'ল রাজ নির্দেশ পালন করা হবে।

এই সামন্তদের মধ্যে একজন ছিলেন মনোরমার এক দূর সম্পর্কের মামা। ঐ বৃদ্ধ সামন্তদের পরামর্শ জেনে গভীর রাতে গিয়ে উপস্থিত হলেন রাজপুত্রদের শিবিরে। তাদের ঘুম থেকে তুলে বললেন, কারণ কি জানি না, তবে স্বয়ং মহারাজ পরিত্যাগসেন নিজে সই করে চিঠি পাঠিয়েছেন তোমাদের হত্যা করবার জন্য। কাল সকালেই সামন্তরা রাজাদেশ পালন করবেন। তার আগেই তোমরা পালাও।

রাজপুত্রেরা গোপনে তাদের ঘোড়া নিয়ে পালালেন। বৃদ্ধ দাদুও

পালালেন তাদের সঙ্গে। সারারাত ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁরা এলেন বিন্ধ্যারণ্যের কাছে। ক্রমে বেলা বাড়তে থাকল। তাঁরা থামলেন না। রৌদ্রের তাপ এবং সেই সঙ্গে পথশ্রমে তিনটি ঘোড়াই এক সময় মুখ থুবড়ে পড়ে গেল এবং মরে গেল। বৃদ্ধ দাদুও আর উঠলেন না।

রাজপুত্রেরা সংকটে পড়লেন তখন তাঁদের মনে হ'ল, বাবা তো যাত্রার আগে সংকটে পড়লে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার স্তব করতে বলেছিলেন। মনে পড়তেই তাঁরা দুর্গার স্তব শুরু করলেন।

এদিকে ভোর না হতেই শিবিরে জানাজানি হয়ে গেল যে, রাজপুত্রেরা পালিয়েছেন। সামন্তেরা সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে চর পাঠালেন এবং সেই সঙ্গে সব অবস্থা জানিয়ে রাজাকে চিঠি পাঠালেন।

চিঠি পেয়ে রাজা হতবাক। তিনি পুত্রদের হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন! অসম্ভব! দেবীর অনুগ্রহে যে পুত্রদের পেয়েছেন তিনি, তাঁদের তিনি হত্যা করবেন! ছিঃ ছিঃ কি ষড়যন্ত্র!

তাঁর নামে যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল, তা হাতে পেয়েই তিনি বিদেশমন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। ক্রমে ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল। তিনি বিদেশমন্ত্রীকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন আর কাব্যালংকারাকে পাঠিয়ে দিলেন মাটির নীচে এক অন্ধ কারাগারে। বললেন, তোমার মন যেমন কুটিল এবং অন্ধকার, তুমি তেমনি থাক ঐ কারাগারে।

এদিকে বিন্ধ্যারণ্যে রাজপুত্র ইন্দীবরসেনের সামনে দেবী আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে এক তরবারি দিয়ে বললেন—যাও, এই তরবারি হাতে থাকলে তুমি হবে অজেয়—তোমার সর্বকর্মে সিদ্ধি হবে। তুমি দক্ষিণ দিকে যাত্রা কর। তোমার মঙ্গল হোক!

দাদার এই সিদ্ধিতে ছোটভাই অনিচ্ছা খুবই খুশী হ'লেন। দুজনে যাত্রা করলেন দক্ষিণ দিকে।

কয়েকদিন পরে তারা এক ঘোর অরণ্যের মধ্যে এক সোনার তৈরী নগরে এসে পড়লেন। চারদিকে মস্ত উঁচু প্রাচীর। ঘুরতে ঘুরতে নগরের সিংহদরজা খুঁজে বের করলেন তাঁরা। এক রাক্ষস হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, তোরা কারা?

ওঁরা আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, এ নগরের নাম কি? এর রাজাইবা কে?

রাক্ষস বলল, এ নগরীর নাম শৈলপুরী। এর রাজার নাম যমদ্রংষ্ট্রা।

ইন্দীবর বললেন, আমি এই পুরীতে প্রবেশ করতে চাই।

রাক্ষস বলল, অসম্ভব। যমদ্রংষ্ট্রা এ নগরে কাউকে প্রবেশ করতে দেন না।

ইন্দীবর বললেন, আমি ঢুকবই। বলে যেই এগুতে গেলেন, অমনি রাক্ষস তাকে বাধা দিল। ইন্দীবর দেবীদত্ত তলোয়ার উঁচু করতেই সেই রাক্ষস আর্তনাদ করে উঠল। ইন্দীবর দেখল তলোয়ার থেকে আগুন বেরিয়ে একেবারে পুড়িয়ে ফেলল রাক্ষসটিকে।

পুরীর মধ্যে প্রবেশ করল ইন্দীবর। লোকজন নেই কোথাও। প্রশস্ত রাজপথ। দুপাশে দোকান। থরে থরে নানা দ্রব্য সাজান। কিন্তু না ক্রেতা না বিক্রেতা।

অনিচ্ছাসেন বলল, আচ্ছা মজা তো দাদা!

ইন্দীবর বলল, নিশ্চয়, কোন রহস্য আছে।

সামনে পড়ল, এক মস্ত প্রাসাদ! অন্য সব বড় বড় বাড়ি থেকে এর গড়নই আলাদা। অনিচ্ছাসেন বলল, দাদা, এটা বোধহয় রাজবাড়ি।

ইন্দীবর বলল, চল ঢুকি।

ঢুকল দুজনে। সামনেই এক বিশাল সভাগৃহ। তার শেষপ্রান্তে এক সিংহাসন। তাতেও এক রাক্ষস বসে আছে। তার দুপাশে দুই সুন্দরী নারী। ওরা ঢুকতেই রাক্ষস চেঁচিয়ে উঠল, কে তোরা!

ইন্দীবর বলল, আমরা মানুষ। আমরা জানতে চাই, এ পুরী সোনারই বা হ'ল কিভাবে, আর জনশূন্যই বা হলো কি করে?

রাক্ষস হা হা করে হেসে বলল, বটে বটে! খুব সাহস তো তোদের। এ সব কথার উত্তর চাইছিস রাক্ষসরাজ যমদ্রংষ্ট্রার কাছে! তবে দেখ, কিভাবে এ নগরী জনশূন্য হয়েছে! বলেই হাত বাড়িয়ে দিল রাক্ষস।

ইন্দীবর মুহূর্তে এক কোপে কেটে ফেলল সে হাত। কিন্তু সাথে

সাথে আবার হাত গজাল সেখানে। রাক্ষস আবার হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল তাদের। ইন্দীবর এবার আর তলোয়ারের আঘাত না করে তলোয়ারের ডগাটা এগিয়ে দিল রাক্ষসের দিকে। সেখান দিয়ে ফিনকি দিয়ে আগুন বের হতে থাকল। যমদ্রংষ্ট্রা মরণ যন্ত্রণায় ক'কিয়ে উঠে ভস্ম হয়ে গেল।

এতে কিন্তু ঐ দুই সুন্দরী নারী অখুশী হ'ল না। তারা আনন্দে এগিয়ে এসে ইন্দীবরকে স্বাগত জানাল। দুজনের মধ্যে বড় মেয়েটি বলল, বীরবর! প্রথমে আমাদের পরিচয় শুনুন। এই নগরের রাজা ছিলেন বীরভুজ। যমদ্রংষ্ট্রা তাকে হত্যা করে এ নগর দখল করে। সে পুরীর সব লোকজন পালায়। তখন যমদ্রংষ্ট্রা আপন যাদুতে এই নগরকে সোনার করে ফেলে। ঐ নারীর সঙ্গে বীরভুজের বিবাহের স্থির ছিল। কিন্তু বিয়ের আগেই যমদ্রংষ্ট্রা তাকে হত্যা করে। এ নারীকে সে নিজে বিয়ে করতে চায়। এর নাম মদন মঞ্জরী। এ এক ব্রতের নাম করে এতদিন বিয়েকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু আপনি রক্ষা না করলে ঐ রাক্ষস কাল ওকে জোর করে বিয়ে করত। আপনি ওকে রক্ষা করেছেন।

ইন্দীবর বলল, আপনার পরিচয় ?

মেয়েটি বলল, আমার নাম খড়্গদ্রংষ্ট্রা। নাম শুনেই বুঝেছেন। আমি যমদ্রংষ্ট্রার আত্মীয়া। আমি তার বোন। কিন্তু তার মৃত্যুতে আমি খুশী। কেন না সে আমাকে সারা দিনরাত বন্দী করে রাখত। শুধু দিনে ঘণ্টা কয় বের করে এনে বসিয়ে রাখত সামনে। ওর মৃত্যু না হলে আমাকে আজীবন বন্দীদশায় কাটাতে হ'ত।

মদনমঞ্জরী বললে, হে বীর! আপনার পরিচয় জানি না। কিন্তু আপনি আমাদের দুজনকেই রক্ষা করেছেন—প্রাণ দিয়েছেন। এই নির্বান্ধব পুরীতে আপনার মত বীরের সাক্ষাৎ পাব, এ আমাদের স্বপ্নেরও অগোচরে ছিল। আপনি আমাদের জীবন যদি বাঁচিয়েছেন, তবে আপনি আমাদের বিবাহ করে, এ রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসুন। এখানে নতুন জনবসতি গড়ে তুলুন।

অনিচ্ছাসেন বললে, এ অতি সাধু প্রস্তাব। দাদা, তুমি এ সিংহাসন গ্রহণ কর। এই দুই নারীকেও বিবাহ কর।

ইন্দীবর বললে, বেশ তাই হোক। দেখা যাক! দেবী কোন্ অভিপ্রায়ে আমাদের এখানে আনলেন।

* * *

শৈলপুরে অনেক দিন কেটে গেল। অনিচ্ছাসেন দাদাকে বলল, দাদা, এবার ইরাবতীতে ফেরা দরকার। বাবা-মা কেমন আছেন, কে জানে। আমার মন উতলা হয়েছে।

ইন্দীবর বলল, আমারও।

ওদের কথা শুনে মদনমঞ্জরী বললে, রাজপুত্র তোমাদের সরাসরি ঐ রাজ্যে যাওয়া উচিত নয়। অবস্থা বুঝে যাওয়া উচিত। কে জানে ষড়যন্ত্রের জাল কতদূর ছড়িয়েছে।

অনিচ্ছাসেন বলল, মন্দ কথা নয়। কিন্তু কিভাবে গোপনে সংবাদ নেওয়া যেতে পারে?

খড়্গদ্রংষ্ট্রা বললে, আমার এক দেবীদত্ত বিমান আছে। তা আকাশ পথে ইচ্ছামত যেতে পারে।

অনিচ্ছাসেন বলল, দাদা! তাহলে ঐ বিমানে করে আমিই ইরাবতীতে যাব। নামব কোন গোপন স্থানে। গোপনে সংবাদ নিয়ে সুবিধা বুঝলে রাজ্যে প্রবেশ করব। যে অবস্থাই হোক আমি ছ'মাসের মধ্যে এখানে ফিরে আসব।

এ প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হল। অনিচ্ছাসেন বিমানে যাত্রা করল ইরাবতী নগরে। সে নামল, নগরীর পাশের এক অরণ্যে। সেখানে এক মন্দিরের পুরোহিত দুভাইকেই স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে গিয়ে উঠল অনিচ্ছা। তিনি চমকে উঠলেন। বললেন, তুমি বেঁচে আছ ছোট রাজকুমার!

অনিচ্ছাসেন বলল, দাদাও বেঁচে আছেন। কিন্তু রাজ্যের সংবাদ কি?

পুরোহিত বললেন, ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে। তোমাদের সৎ-মা এবং

বিদেশমন্ত্রী এতে জড়িত ছিল। রাণী পাতাল কারাগারে বন্দী আছেন, বিদেশমন্ত্রী বিতাড়িত হয়েছে। রাজারাণী তোমাদের বিচ্ছেদে জীবন্মৃত হয়ে আছেন।

অনিচ্ছার আর তর সইল না। সে ছুটল রাজপ্রাসাদের দিকে। প্রজারা তাকে চিনতে পেরে জয়ধ্বনি করে উঠল। প্রাসাদে সে কোলাহল পৌঁছালে প্রহরীরা প্রাসাদ শীর্ষ থেকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে চিনতে পারল রাজপুত্রকে। ছুটে গিয়ে সংবাদ দিল রাজারাণীকে। তাঁরা ছুটলেন সিংহদ্বারের দিকে।

পথেই রাজারাণীর সঙ্গে দেখা হ'ল ছোট রাজপুত্রের। রাজারাণী জড়িয়ে ধরলেন তাকে। আনন্দে অশ্রুর বাণ বইল।

এদিকে যে পরিচারিকা রোজ কাব্যালঙ্কারাকে খাবার দিতে আসত, সে বল্‌ল, জান, রাণীমা! ছোট রাজপুত্র ফিরে এসেছেন। বড় রাজপুত্রও বেঁচে আছেন। তিনি এক সোনার তৈরী নগর জয় করেছেন। দুই রাণী তাঁর। সব সংবাদ শুনে রাজ্যে আনন্দের স্রোত বইছে আর সবাই তোমাকে ধিক্কার দিচ্ছে!

শুনে কাব্যালঙ্কারা আরও বেদনায় ভেঙ্গে পড়লেন। মনে মনে দেবী দুর্গাকে স্মরণ করে বল্‌তে থাকলেন, দেবী! শঠতা করে যে আমাকে তোমার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করল, সেই হ'ল জয়ী! আর আমি আজীবন অবহেলিতই থেকে গেলাম! কোন্‌ পাপে আমায় এ শাস্তি দিলে দেবী!

তার আকুল কান্নায় দেবী আবির্ভূতা হয়ে বললেন, মায়ের পাপ পুত্রে বর্তায়। অনেক কষ্ট ভোগের ভেতর দিয়েই ঘটে সে সংকট থেকে মুক্তি। অধৈর্য হয়ো না। তোমার মুক্তির দিন সমাগত। প্রতীক্ষা কর।

এদিকে আনন্দে আনন্দে ছ'মাস কেটে এলো। অনিচ্ছাসেন এবার শৈলপুরে ফিরে যাবার কথা বল্‌ল। রাজারাণী তাকে একা ছাড়লেন না। নিজেরাও চড়লেন বিমানে ইন্দীবরের কাছে যাবার জন্য।

কিন্তু শৈলপুরে এক নিদারুণ দুঃসংবাদ। অনিচ্ছাসেন যাবার পর পরই সহসা অদৃশ্য হয় ইন্দীবরের দেবীদত্ত তরবারি। ইন্দীবরও মৃতবৎ

পড়ে যায়। দুই রাণী কিছুতেই তাকে সুস্থ করতে পারে নি। ইন্দীবরের দেহ সোনার পালঙ্কে শোয়ানো। কিন্তু তাতে প্রাণ নেই। এত দিনে তাতে পচনও ধরেনি। তার দিকে তাকিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠল অনিচ্ছাসেন। তারপর সেও পড়ে গেল মাটিতে। তাকে সকলে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিল। দেখা গেল, তার দেহেও প্রাণ নেই।

রাজা পরিত্যাগসেন বললেন, নিশ্চয় দেবীর কাছে কোন অপরাধ ঘটেছে।

রাণী মনোরমা বললেন, আমি দেবীর কাছে ধর্ণা দেব।

রাজা বললেন, আমিও।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। রাজারাণী ধর্ণা দিয়ে পড়ে আছেন দেবীর মন্দিরে। হঠাৎ মনোরমা ঠেলা দিয়ে ডাকলেন রাজাকে। বললেন, রাজা! ওঠো, আমি বুঝেছি আমার অপরাধ। আমি কাব্যালঙ্কারাকে বঞ্চিত করে পুত্র নিয়েছি। নিয়েছি সব সুখ। আমার মন কুটিল। আসল ষড়যন্ত্র করেছি আমি। মহারাজ আমারই পাপে রাজপুত্রেরা মৃত। তুমি যাও। কাব্যালঙ্কারাকে এখানে নিয়ে এসো। তার স্পর্শে এবং ক্ষমাতেই রাজপুত্রেরা বাঁচবে।

রাজা সঙ্গে সঙ্গে বিমানে করে গেলেন ইরাবতীতে। কাব্যালঙ্কারাকে কারাগার থেকে মহাসমাদরে বের করে এনে বললেন, তোমার প্রতি আজীবন অন্যায় করেছি। ক্ষমা কর!

কাব্যালঙ্কারা বললেন, অন্যায় নয় মহারাজ। আমাদের মধ্যে অনেক কলুষ জমেছিল। দুঃখের আগুনে তার সব পুড়ে গেল। দেখবেন এবার সব খাঁটি সোনা হয়ে উঠবে।

শৈলপুরে পৌঁছাতেই ছুটে এলেন মনোরমা। বললেন, আমিই তোমাকে সব সুখে বঞ্চিত করেছি। কূট ষড়যন্ত্র করেছি। আমায় ক্ষমা কর দিদি। পুত্রদের আমি দেবীর পা স্পর্শ করে তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। তুমি ওদের ছুঁয়ে বাঁচিয়ে তোল।

৬

কাব্যালঙ্কারা বললেন, কোথায় ওরা ? কি হয়েছে ওদের ! আমি যে ওদের একটু আদর করার জন্য কবে থেকে বসে আছি ! কবে থেকে ওদের একটু মা ডাক শোনার জন্য···

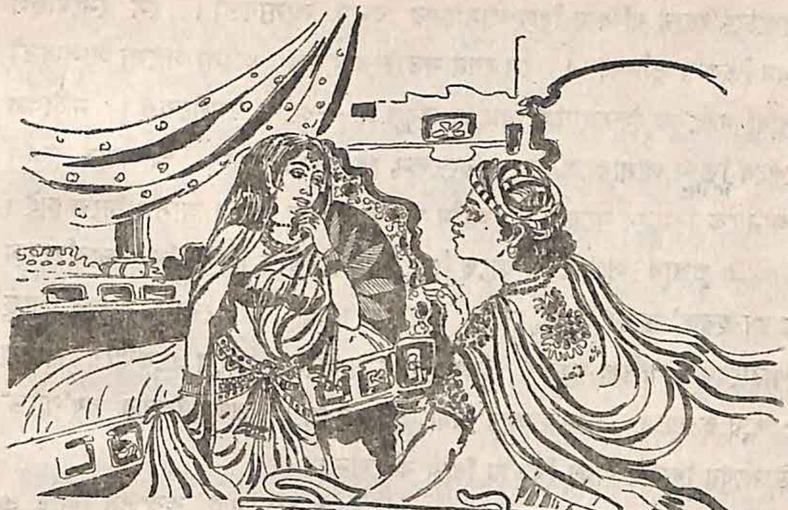
আর শেষ করতে পারলেন না কাব্যালঙ্কারা। মনোরমা তার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন যেখানে শোয়ান রয়েছে রাজপুত্রেরা। কাব্যালঙ্কারা গিয়ে তাদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বললেন, সে কি! তীরে এসে তরী ডুবল ! আমি আসবার আগেই বাছারা শেষ ঘুমে ঢলে পড়ল।

না শেষ ঘুম নয়, বলে উঠে বসল ইন্দীবরসেন।

অনিচ্ছাসেন চোখ মেলে কাব্যালঙ্কারাকে দেখে বলল, রাক্ষসী ! আবার যড়যন্ত্র করতে এসেছিস।

মনোরমা তাড়াতাড়ি তার মুখে চাপা দিলেন। বললেন, ও কথা বলিস না বাবা। উনি দেবী। আজীবন কষ্ট সহ্য করেও আজ তোদের বাঁচিয়েছেন। ষড়যন্ত্র আমিই করেছি। আমিই রাক্ষসী।

কাব্যালঙ্কারা এবার মনোরমার মুখ চেপে ধরে বললেন, ছিঃ। এ সব বলতে নেই। তারপর ওদের দিকে ফিরে বললেন, আমায় তোরা একবার মা বলে ডাক বাবা ! আমার জীবন ধন্য হক !



ভীমভট্ট
সমরভট্টের কথা

রাধা রাজ্যের রাজার নাম ছিল উগ্রভট্ট। পাটলিপুত্রের এক রাজার একমাত্র কন্যা মনোরমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। পুরোহিত যজুঃস্বামী নিজে কন্যা নির্বাচন করে বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মহারাজ এই কন্যা থেকে আপনার বংশের মর্যাদা বাড়বে।

উগ্রভট্ট এ বিয়েতে খুবই খুশি ছিলেন। মনোরমাকে উপেক্ষা করারও কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু বিধি বাম। বিবাহের এক বছর পূর্ণ হলে মন্ত্রীরা এক উৎসবের আয়োজন করলেন। তাতে বিদেশ থেকে এক বিখ্যাত নাট্যদল নিয়ে আসা হ'ল। তারা উৎসবে নাট্যাভিনয় করে মাতিয়ে তুললে। ওদের প্রধান লাসক বললেন, আমাদের শ্রেষ্ঠ অভিনয় হবে শেষ দিনে।

শেষ দিনে ওরা অভিনয় করলেন অমৃতহরণ পালা। বিষ্ণু কেমন করে মোহিনীমূর্তি ধরে অসুরদের কাছ থেকে অমৃত হরণ করে দেবতাদের জয়ী করলেন তারই কাহিনী বর্ণিত হ'ল ঐ পালায়। সত্যিই যেন দেবদানবের সেই মরা-বাঁচার লড়াই রূপ নিল মঞ্চে। কিন্তু

সবচেয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিল লাসাকের কন্যা লাস্যবতী। সে নেমেছিল অমৃতিকার ভূমিকায়। সে যেন সত্যই অমৃত। হাস্যে লাস্যে লাস্যবতী শুধু নাটকের দৈত্যদেরই বিমুগ্ধ করল না—করল রাজাকেও। নাটকের শেষে তিনি লাসাককে ডেকে বললেন, হে শিল্পীশ্রেষ্ঠ! আপনার কন্যা আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। আমি তাকে আমার রাণীর আসন দিতে চাই।

এ প্রস্তাব লাসাকের কাছে ছিল কল্পনাতীত। তিনি ভেবেছিলেন রাজা হয়ত' তাকে কিছু বেশি অর্থ দেবেন বা আর কোন রাজার কাছে পাঠাবেন সুপারিশ করে। কিন্তু সেই সামান্যের বদলে একেবারে রাজার শ্বশুর হওয়া। লাসক আর দ্বিধা করলেন না। প্রথম বিয়ের বর্ষপূর্তি উৎসবের দিনেই রাজা দ্বিতীয় বিয়ে করলেন।

সেকালের রাজারা অমন দু চারটি বিয়ে হামেশাই করতেন আর এ নিয়ে রাণীদেরও তেমন মাথাব্যথা ছিল না। তাই মনোরমা এ বিয়েকে খুশি মনেই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এর পর রাজা যা করা শুরু করলেন, তাতে তার বুকে দুঃখের ছায়া পড়তে থাকল। রাজা রাজ্য-শাসন থেকে সবকিছু ছেড়ে ছোট রাণী লাস্যবতীর মহলে পড়ে থাকলেন। সেখানে নৃত্য-গীতে অভিনয়ে দিনরাত বিচিত্র প্রমোদ চলতে থাকল। রাজা একবার মনোরমার কথা ভাবলেনও না—ডাকলেনও না।

এমনি করে বছর কয়েক কেটে গেলে রাজা একদিন মলিন মুখে ছোটরাণীর মহল থেকে বেরিয়ে এসে গেলেন রাজোদ্যানের বেদীতে। মন্ত্রী, পারিষদ এবং পুরোহিতরা ঘিরে ধরলেন তাকে। বললেন, মহারাজ, আপনার মুখ মলিন কেন?

রাজা বললেন, আমার মন বড়ই খারাপ। এতদিনেও আমার কোন পুত্রকন্যা জন্মাল না কেন?

মন্ত্রী বললেন, এতে আপনার মন খারাপ করবার প্রয়োজন নেই। আমাদের বিজ্ঞ পুরোহিত আছেন যজুঃস্বামী। তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবেন। তাহলেই আপনার পুত্র জন্মাবে।

রাজা বললেন, তাহ'লে যজুঃস্বামীকে আজই যজ্ঞ আয়োজনের নির্দেশ দিন।

যজ্ঞস্বামী সেখানেই ছিলেন। তিনি বললেন, আমি রাজাদেশ মাথা পেতে নিলাম। অচিরেই যজ্ঞের আয়োজন করছি।

যজ্ঞ হ'ল। যজ্ঞের শেষে এক দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হয়ে পুরোহিতের হাতে যজ্ঞ চারু তুলে দিলেন। পুরোহিত সেই চারু দুইভাগে ভাগ করে প্রথমভাগ রাণী মনোরমাকে এবং দ্বিতীয় ভাগ লাস্যবতীকে দিলেন। আর সত্যিই যজ্ঞফলে রাজা দুই পুত্র লাভ করলেন। মনোরমার পুত্রের নাম রাখা হ'ল ভীমভট্ট আর লাস্যবতীর ছেলের নাম রাখা হ'ল সমরভট্ট।

রাজপ্রসাদে বড় হয়ে উঠতে থাকল দুই রাজপুত্র। ভীমভট্টের সুকৌমার্যের যেমন তুলনা হয় না, তেমনি রূপের তুলনা হয় না সমরভট্টের। ছোট রাজপুত্রের দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, এত তার রূপ, বড়রাজপুত্রের দিকে তাকালে চোখ ফেরান যায় না, তা এত মায়াময়। সকলে বলে, না হবে কেন! দু জনেই যে দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে জন্মেছে।

দুই পুত্র যতই বড় হতে থাকল, ততই তাদের স্বভাবের পার্থক্য ধরা পড়তে থাকল। ভীমভট্ট, যেমন বিনয়ী, তেমন দৃঢ়। সমরভট্ট যেমন উগ্র তেমন মেজাজী। ভীমভট্ট যতই বড় হতে থাকল ততই সে বিদ্যায় বুদ্ধিতে বীর্যে সেরা হয়ে উঠতে থাকল আর যতই বড় হতে থাকল সমরভট্ট ততই তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকল রাজ্যের লোক। তারা বলতে থাকল, না হবে কেন! নাচুনীর ব্যাটা কি রাজকুমারীর ছেলের মত হতে পারে! ভীমভট্টই যোগ্য রাজপুত্র।

রাজা উগ্রভট্ট কিন্তু এ কথা মানলেন না। সমরভট্ট হ'ল তার নয়নের মণি। সমরের উগ্রতা, মেজাজ বা অত্যাচারের কথা কেউ কেউ তাঁকে বললেই তিনি বলতে থাকলেন, এই তো যোগ্যরাজপুত্রের আচরণ। তবে কি রাজপুত্র সাধারণ লোকের ছেলের মত ভ্যাদভেদে হবে! আমার বড় ছেলেকে দেখ না। সাত চড়ে মুখে কথা নেই। মাথা নীচু করেই আছে। তেজ চাই তেজ। তা আছে সমরভট্টের মধ্যে।

রাজার এসব কথায় সমরভট্ট আরও মাথায় চড়ে বসত। প্রতি কাজে অপদস্থ করতে চাইত ভীমভট্টকে। ভীমভট্ট এসব গায়ে মাখতে না।

যথাসম্ভব এড়িয়ে চলত ছোট ভাইকে। ভাবত, ছোট বলেই চঞ্চল—ওকে যদি আমি দাদা, আমি ক্ষমা না করতে পারি তোকে করবে!

কিন্তু সমরভট্ট দিন দিন এমন কাণ্ড ঘটাতে থাকল যে ভীমভট্টের পক্ষেও অসহ্য হয়ে উঠল। একদিন দুভাই মল্লযুদ্ধ করছিল গুরুর কাছে। সুযোগ পেয়ে সমরভট্ট নিয়মবিরুদ্ধভাবে রুদ্দা কষাল ভীমের ঘাড়ে। ভীমভট্ট বলেই তাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল না। কিন্তু রাগে তার সারা গা জ্বলে উঠল। ভীম তাকে দুহাতে তুলে ধরে ছুঁড়ে দিল বালির গাদায়। তাতেই সমর যা চোট পেল, তাতে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল।

সমরের ভৃত্যেরা তার দেহ তুলে নিয়ে গেল তার মায়ের কাছে। তার দেহের নানা স্থানে তখনও রক্ত ঝরছে। এতে লাস্যাবতী দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন রাজবৈদ্যকে এবং রাজাকে।

রাজবৈদ্য দেখে ব্যবস্থাপত্র দিলেন এবং বলে গেলেন সমরভট্টকে খুবই সাবধানে রাখতে। অল্পে তার মৃত্যুর ফাঁড়া কেটেছে। এ কথা শুনে লাস্যবতী খুবই কাঁদতে শুরু করলেন। রাজা এসে স্ত্রী এবং পুত্রকে ঐ অবস্থায় দেখে খুবই মর্মাহত হলেন। লাস্যবতী কেঁদে পড়লেন রাজার পায়ে। বললেন, আমি আপনাকে বলতে চাই না। কিন্তু আজ না বলে পারছি না। ভীম সমরকে এমনই হিংসা করে, ওকে এমনইভাবে মারে। মহারাজ! এমন ছেলে যে কোন দিন আপনাকেও খুন করে ফেলতে পারে।

ক্ষুব্ধ রাজা ঘটনাটা ভাল করে অনুসন্ধানও করলেন না। পরদিন সভায় ভীমভট্টকে রাজসভা থেকে বের করে দিলেন। বন্ধ করে দিলেন তার বৃত্তি। তবু ভীম বাবার পদধূলি নিয়ে সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে এলো।

এ সংবাদ শহরে ছড়িয়ে পড়লে, রাজধানীর সবাই বিক্ষুব্ধ হ'ল। তারা বলাবলি করতে থাকল, নাচুনীর মোহে রাজা কি শেষে ভীমভট্টকে রাজ্য থেকেও বঞ্চিত করবেন না কি? আমাদের কি শেষে ঐ নাচুনীর ব্যাটার হাতে পড়তে হবে! তা হলে আমরা বিদ্রোহ করব।

রাজপুরুষেরাও ক্ষুণ্ন হলেন। তাঁরা তলায় তলায় নিজেরা অর্থ সংগ্রহ করে ভীমভট্টকে দেবার সঙ্কল্প করলেন।

সব শুনে ছেলের জন্য খুবই দুশ্চিন্তা হ'ল মনোরমার। তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন, বাবা, তুমি এক কাজ কর। তোমার দাদুর কাছে পাটলিপুত্রে চলে যাও। তাঁর কোন পুত্র নেই। তিনি তোমাকে সাদরে বরণ করে সে রাজ্য দেবেন। তুমি নিরাপদ থাকবে।

ভীমভট্ট বললে, না মা আমি ওভাবে পালিয়ে যাব না। সমরভট্টের শক্তি নেই যে আমার ক্ষতি করে। আমি কাপুরুষের মত পালাব না।

মনোরমা বললেন, আমি জানি তোমাকে কেউ সামনাসামনি পরাজিত করতে পারবে না। কিন্তু বাবা, রাজনীতি বড় কুটিল আর রাজা নিজে তোমার প্রতি বিরূপ। যদি কোন ষড়যন্ত্র করে····

ভীম বললে, মা, তেমন অবস্থায় পড়লে তোমার কথায় আত্মরক্ষার্থে দূরদেশে যাব মা। কিন্তু সে সময় এখনও আসেনি।

মনোরমা ভীমের কথা মেনে নিলেন। তখনকার মত রাজসভা থেকে বহিস্কৃত এবং বৃত্তিচ্যুত ভীমভট্ট রাধাতেই রয়ে গেলেন। কিন্তু সমরভট্ট একটু সেরে উঠেই এমন অবস্থা করল যে ভীমকে রাধা ছেড়ে পালাতেই হ'ল। কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

ইতোমধ্যে রাজপুত্রদের এক বন্ধু শংখদত্ত সমরভট্টের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে বলল, দেখ্ সমর, তোর আচার-আচরণ মোটেই ভাল হচ্ছে না। এর ফলে কিন্তু তোরই ক্ষতি হবে।

কে ক্ষতি করবে আমার? বলল সমরভট্ট।

শংখদত্ত বলল, রাজা চিরকাল বেঁচে থাকবেন না। তাঁর অবর্তমানে, আর যারা তোর ওপর চটে থাকছে, তারা শোধ নেবে।

সমরভট্ট বলল, তুইও কি তাদের দলে না কি?

শংখদত্ত বলল, দলাদলি বুঝি না। বন্ধু হিসাবে যা ভাল বুঝি তা বলি। মানা না মানা তোর নিজের ব্যাপার!

সমরভট্ট চোখমুখ বাঁকিয়ে বলল, বন্ধু! বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। সামান্য প্রশ্রয় দি বলে রাজপুত্রকে বন্ধু বলতে স্পর্ধা হয় তোমার!

সামান্য এক বণিকের ছেলের এত স্পর্ধা! বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে।

বেশ যাচ্ছি। বলে চলে এলো শঙ্খদত্ত। আর সমরভট্টের অনুচরেরা পালিয়ে গেল, পালিয়ে গেল বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। চূড়ান্ত অপমান মাথায় নিয়ে শঙ্খদত্ত গিয়ে উঠ্‌ল ভীমভট্টের কাছে।

ভীম বল্‌ল, কি হয়েছে ভাই!

শঙ্খদত্ত সব ঘটনা খুলে বল্‌ল। ভীম সব শুনে ব্‌লল, মূর্খকে উপদেশ দিতে গিয়ে তুমিই ভুল করেছ। কখনও গর্বী আর মূর্খকে উপদেশ দিতে নেই।

শঙ্খ বল্‌ল, ঠিকই বলেছ। আমারই ভুল হয়েছে। ভবিষ্যতে আর ভুল করব না। শঙ্খদত্ত সমরভট্টের কাছে যাওয়া ছেড়েই দিল। হয়ে উঠ্‌ল ভীমভট্টের বন্ধু।

একদিন সে সংবাদ নিয়ে এলো যে, রাজ্যে এক অশ্ববিক্রেতা এসেছে। তার সংগ্রহে আছে অসামান্য অশ্ব। দুধের মত সাদা রং তার। কণ্ঠধ্বনিকে যেন বীণা আর শঙ্খ একত্রে বাজছে। তার কেশরদাম দেখলে মনে হয় ক্ষীর সমুদ্রে ঝড় উঠেছে।

সংবাদ শুনেই ভীমভট্ট শঙ্খকে নিয়ে ছুটলেন বণিকের কাছে। অশ্ব দেখে সত্যিই মুগ্ধ হবার মত। ভীমকে রাজপুত্র জেনে সওদাগর ভেবেচিন্তেই দাম বল্‌ল। ভীম রাজী হয়ে তখুনি দাম দিয়ে দিল। সওদাগর তার অনুচরদের সাজসজ্জা পরিয়ে ঘোড়াটি এনে দিতে বলল। আর ততক্ষণ সে নানা দেশের অভিজ্ঞতার কথা বলতে থাকল ভীমভট্টকে।

অনুচরেরা যখন ঘোড়া এনে ভীমভট্টর হাতে দিতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই বহু অনুচরসহ সমরভট্ট এসে পড়ল সেখানে। বল্‌ল, এ ঘোড়াটি আমার চাই।

সওদাগর বল্‌ল, তা তো হয় না। আমি আগেই দাম পেয়ে ওঁকে অশ্ব বিক্রি করে দিয়েছি।

সমরভট্ট বল্‌ল, আমি তিনগুণ দাম দেব।

সওদাগর বলল, সহস্র গুণ দাম দিলেও ও অশ্ব আর বিক্রির অধিকার আমার নেই। ও অশ্বের মালিক এখন রাজপুত্র ভীমভট্ট।

রাজপুত্র! ব্যঙ্গ করে উঠল সমরভট্ট। যার রাজসভায় ঢুকবার অধিকার নেই, যে বৃত্তি পায় না, সে রাজপুত্র কিসের? ও ঘোড়া আমার চাই। দরকার হ'লে শক্তি দিয়ে ছিনিয়ে নেব।

সমরভট্টের কথা শেষ হতে না হ'তে ওর অনুচরেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ভীমভট্টের হাত থেকে বল্গা ছিনিয়ে নিতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে উঠল ভীমের হাতের তলোয়ার। শঙ্খদত্তও তার তলোয়ার খুলল। কিন্তু সমরভট্টের অনুচরেরা মুখে যত দড় ছিল, যুদ্ধে তত নয়। ফলে মুহূর্তে হয় তারা কাটা পড়ল নয় পালাল। দেখা গেল সমরভট্ট একা দাঁড়িয়ে আছে।

শঙ্খদত্ত লাফ দিয়ে চেপে ধরল তার চুলের মুঠি। তুল্‌ল তলোয়ার। কিন্তু ছুটে এসে হাত চেপে ধরল ভীমভট্ট। বল্‌ল, করছ কি! ওকে হত্যা করো না। বাবা খুবই দুঃখ পাবেন।

শঙ্খ বলল, বেশ ছেড়ে দিলাম। তবে সাক্ষ্য রেখে দেব। বলে ওর মাথার এক দিক তলোয়ার দিয়ে চেঁছে দিল। সমরভট্ট ছাড়া পেয়েই ছুটল প্রাসাদের দিকে। আর শঙ্খদত্তের বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে ভীমভট্ট ঐ সওদাগরের কাছ থেকে এক মস্ত কালো রংএর ঘোড়া কিনে দিলেন।

সেই শ্বেত আর কৃষ্ণ অশ্ব নিয়ে ভীম আর শঙ্খ ভীমের আবাসে পৌঁছাতেই এক ব্রাহ্মণ তাদের কাছে এলেন। বল্‌লেন, বাছা শোন। আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন তোমার মা, পুরোহিত যজ্ঞঃস্বামী এবং মন্ত্রী সুমতি। তাঁরা তোমাকে এখুনি প্রাসাদ ত্যাগ করে পালাতে বলেছেন। আজকের ঘটনায় মহারাজ ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে বন্দী করবার আদেশ দিয়েছেন। এই রত্নপেটিকা নিয়ে তুমি এখুনি প্রাসাদ ছেড়ে পালাও।

ভীমভট্ট অবস্থা বুঝে তখুনি যাত্রা করলেন। নতুন অশ্বে

বসলেন দুজনে। ভীম নিল রত্নপেটিকা। শংখ নিল খাবার। অশ্ব ছুটল তীর বেগে। নতুন আশ্রয়ের জন্য ছুটে চলল দুই বন্ধু।



দুই

মাঝ রাতে চাঁদ উঠল। দুই বন্ধু দেখল তারা শারবনে এসে পেঁছেছে। কিন্তু এত বিশ্রামের স্থান নয়। অথচ অশ্ব এবং অশ্বারোহী সকলেরই বিশ্রাম দরকার। কি করবে ভাবছে, এমন সময় কাছেই সিংহের গর্জন শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে শুরু করল অশ্ব দুটি। সিংহের পালও ছুটল পিছনে।

শর বনে বুঝি শত শত সিংহ। সামনে পিছনে দু পাশে সিংহের সার। প্রাণপণে ছুটছে অশ্ব দুটি। বল্গার প্রয়োজন নেই। দুই বন্ধু শক্ত হয়ে বসে চারদিকে তলোয়ার চালিয়ে যাচ্ছেন। লাফিয়ে পড়া সিংহেরা সেই অস্ত্রে আহত হয়ে পিছিয়ে পড়ছে। তবু তারই মধ্যে এক আধটির থাবার আঁচড় বা দাঁতের কামড় লাগছে অশ্বগুলির গায়। ওরাও বুঝি আর পারছে না। এমন সময় ওরা দেখলে রাতও শেষ হয়ে আসছে,

শরবনও। তবে বুঝি বিপদ কাটল। কিন্তু কে জানত যে ঘোড়া দুটি অজান্তে অত জখম হয়েছে। শরবন পার হয়েই ওরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তখনও গুটি চার ছয় সিংহ-সিংহী ওদের পিছনে ছুটছিল। ঘোড়া দুটি পড়ে যেতেই তারা উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের দেহে। কয়েক মুহূর্তে ভীম আর শঙ্খদত্তের তলোয়ার তাদের শেষ করে দিল। কিন্তু অশ্বদুটিও আর নড়ল না।

ভীম বল্‌ল, ভাই নিয়তি আমাদের বিরুদ্ধে।

শঙ্খদত্ত বল্‌ল, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রাখ ভাই। আমরা মরবার আগে থামব না। দেখি নিয়তি বড় না আমরা বড়।

শঙ্খদত্তর কথায় মনে ভরসা পেল ভীমভট্ট। মনের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আবার চলতে শুরু করল। খানিক পরে তারা নদীর তীরে উপস্থিত হ'ল।

এখানে ওখানে নানা মুণির কুটির! শান্ত নির্জন পরিবেশ। ওরা স্নান করল। কিছু খাবার খেল। তারপর ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙ্গতে ঝরঝরে হয়ে গেল শরীর। একজন রত্নপেটিকা আর অন্যজন খাবারের পুঁটুলি নিয়ে আবার চলতে থাকল।

সন্ধ্যার মুখোমুখি তারা আরও নির্জন এক পার্বত্য উপত্যকায় পেঁাছাল। সেখানে এক গুহার সামনে তাদের বয়সী এক যুবক সন্ন্যাসীকে বেদ পড়তে শুনল ওরা। দুজনে গিয়ে বসল তার পাশে। স্থির করল, রাতটা এই তরুণ সন্ন্যাসীর পাশেই কাটাবে।

পাঠশেষ করলে ভীম যুবককে জিজ্ঞাসা করল, ভাই এই বয়সে তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ কেন? আর এত নির্জনে একাই বা বাস করছ কেন?

যুবক বল্‌ল, কি হবে আমার অতীত কাহিনী শুনে?

ভীম বল্‌ল, কৌতুহল বশেই তোমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেছি বটে, তবে কাহিনী শুনলে আমরা সকলেই সকলের কাজে লাগতে পারি।

যুবক বল্‌ল, ভাই, আমার কাহিনী এমন কিছু চমকপ্রদ নয়।

বারাণসীতে সামান্য পূজা-আর্চা করে জীবন কাটাতেন আমার বাবা। নাম ছিল শ্রীকণ্ঠ। আমার নাম রেখেছিলেন নীলকণ্ঠ। উপবীত ধারণের পর বাবা আমাকে বিদ্যাচর্চার জন্য গুরুগৃহে পাঠান। দ্বাদশবর্ষ পর যখন বাড়ি ফিরলাম তখন আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ বেঁচে নেই। কি করব! ক'দিন বারাণসীতে পাগলের মত ঘুরে বেড়ালাম। কেউ কেউ উপদেশ দিল, আত্মীয় কেউ বেঁচে না থাকলেও বাড়িখানা তো আছে। বিয়ে-থা করে সংসারী হও। কিন্তু বিয়ে করে সংসারী হতে গেলে অর্থ লাগে। কোথায় অর্থ? তাই একদিন বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এখানে এসে বড় ভাল লাগল। গঙ্গাদেবীকে পুজো করে শুয়ে পড়লাম। রাতে স্বপ্ন দেখলাম, দেবী বলছেন, এখানে থেকে যা। শরবন পার হয়ে এক পুরুষ আসবে এখানে। সে তোর অভীষ্ট পূর্ণ করবে। এখানে আমি নিত্য বেদপাঠ করি। দেবীর কৃপায় ফলমূল আহার্যের অভাব হয় না। আমি অপেক্ষা করছি সেই পুরুষের যিনি সিংহ অধ্যুষিত ঐ শরবন পার হয়ে আসবেন।

নীলকণ্ঠের কথা শুনে ভীমভট্টের মনে প্রশ্ন জাগল যে তাহ'লে সে-ই কি দেবীর বলা সেই পুরুষ, যে যুবকের অভীষ্ট পূরণ করবে! সম্ভবতঃ সে-ই সে পুরুষ। তাই দেবীর আশীর্বাদেই যে পেয়েছিল ঐ অশ্ব, তাঁর আশীর্বাদেই অত সিংহের হাত থেকে বেঁচেছে তারা। ঐ দ্রুতগামী অশ্ব ছাড়া তাদের পক্ষে বাঁচা সম্ভব ছিল না। আর তাই কাজ শেষ হতেই অশ্বেরা বিদায় নিয়েছে।

কিন্তু নীলকণ্ঠের কি অভীষ্ট পূরণ করবে সে? কি ভাবেই বা করবে? হঠাৎ মনে হ'ল তার যে, নীলকণ্ঠের ইচ্ছা ছিল গার্হস্থ্য জীবন যাপন। অর্থাভাবেই পারেনি সে। মনে হতেই ভীমভট্ট আঁজলাভরে রত্ন নিয়ে নীলকণ্ঠকে দিল। বলল, ভাই, যাও গৃহী হও।

নীলকণ্ঠ এত ধন পেয়ে বিগলিত হয়ে পড়ল। বলল, আপনার এ ঋণ শোধ করব কি করে?

ভীম বলল, সময় এলে আমি নিজেই তোমাকে ডাকব।

রাত্রিশেষে নীলকণ্ঠ বিদায় নিয়ে যাত্রা করল বারাণসীর দিকে। শংখদত্ত আর ভীমভট্ট নদীর পাড় ধরে এগুতে থাকল। তারা কোন খেয়াঘাট পেল না। তখন ভীমভট্ট বলল, ভাই, এ পাড়ে থাকা আমি নিরাপদ বোধ করছি না। কে জানে যে সমরভট্ট বা বাবার সৈন্যরা আমাকে অনুসরণ করছে কি না! এ পাড়ে থাকলে সহজেই বন্দী হতে হবে। কিন্তু এ নদী পার হই কিভাবে?

শঙ্খদত্ত বলল, ভাই পার হওয়া যদি স্থির করে থাক, তবে দ্বিধা কেন। নৌকা না মেলে সাঁতরে পার হব। আমরা বাধা বলে থেমে থাকাতে রাজি নই।

ভীমভট্ট বলল, ঠিক বলেছ ভাই। এসো তবে আমরা সাঁতরেই পার হব।

এই বলে ভীম রত্নপেটিকা বেঁধে নিল মাথায় আর শংখদত্ত বাঁধল খাবার। তারপর ঝাঁপ দিল নদীতে।

মাঝ নদী পর্যন্ত দু'জন পাশাপাশি এলো গল্প করতে করতে। কিন্তু তারপরই হঠাৎ নদীতে দেখা দিল প্রবল স্রোত। ছিটকে পড়ল দু'জন দুদিকে। বহু কষ্টে এক সময় ভীমভট্ট উঠল ওপারে। কিন্তু বন্ধু কোথায়? চিৎকার করে ডাকল বন্ধুকে। কোথাও থেকে উত্তর এলো না। তখন অতি দুঃখে ভীম আত্মবিসর্জনের কথা ভাবল। বললে, মা গঙ্গা! তুমি যদি আমার বন্ধুকে নিলে, তবে আমাকেও নাও। বলে জলে ঝাঁপ দিতে গেলেন ভীমভট্ট। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাদেবী আবির্ভূতা হয়ে তাকে বাধা দিলেন। বললেন, আত্মহত্যা করো না। তোমার অকৃতিত্বেই রক্ষা পাবে তোমার বন্ধু। যথাসময়ে মিলনও হবে তোমার সঙ্গে।

ভীমভট্ট বলল, মা! একা পথচলা দুর্ভর।

দেবী বললেন, বন্ধু পাবে। আর এসো তোমাকে এক সপ্তাক্ষরা মন্ত্র শিখিয়ে দি। এর অনুলোম মন্ত্র পড়লে তুমি অদৃশ্য হতে পারবে আর প্রতিলোম মন্ত্র পড়লে আবার দৃশ্য হবে।

এই বলে গঙ্গাদেবী তাকে মন্ত্র শিখিয়ে অদৃশ্য হলেন। মনে মনে দেবীকে প্রণাম করে ভীমভট্ট চলতে থাকল।

সন্ধ্যার মুখোমুখি সে এক নগরে পৌঁছাল। লোকের মুখে শুনল, সেটা 'লাট' রাজ্যের এক নগর। মোটামুটি সমৃদ্ধ। বাড়িগুলো ইটের। দোকান-পসার জাঁক জমকের। নগরে অনেক দ্যুতশালা। তারই একটির প্রায় প্রবেশপথে চার যুবক বসে পাশা খেলছিল। ভীমভট্ট তাদের জিজ্ঞাসা করল, ভাই, এখানে কোথায় রাতের আশ্রয় মিলতে পারে?

এক যুবক বলল, এখানেই পারে। তুমি সারারাত বসে পাশা খেলতে পার! আছে টাকাকড়ি?

ভীমভট্ট বলল, টাকাকড়ি আছে। কিন্তু এই বয়সে পাশা খেলে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করে না।

আর এক যুবক তেড়ে উঠ্‌ল। বলল, অত যদি সাধু ভাব তবে এখানে কেন বাছাধন! মায়ের কোলে ফিরে যাও। আমাদের মত জুয়াড়ীর কাছে কেন?

ভীমভট্টের মনে হ'ল যুবক ক'টি নিজেদের যেমন অসৎ প্রামাণ করতে চাইছে, ওরা ততটা অসৎ নয়। ওদের ব্যায়ামপুষ্ট দেহ, চোখেমুখে আভিজাত্যের স্পর্শ। ওরা যেন আত্মগোপন করতে চাইছে। ব্যাপারটা কি, তা জানবার আগ্রহে চঞ্চল হয়ে উঠল ওর মন। বলল, দেখি তোমরা কতবড় জুয়াড়ী!

এই বলে বসল ওদের সঙ্গে খেলায়। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ওদের সামান্য যা টাকাকড়ি ছিল, সব জিতে নিল ভীমভট্ট। বলল কি আর খেলবে?

প্রথম যুবক তার নাম বলেছিল অক্ষক্ষপণক। সে বলল, এতদিন ধরে খেলেটেলে যা জমিয়েছিলাম, তার সবটাই তো তুমি জিতে নিলে। আর খেলব কি দিয়ে?

দ্বিতীয় জন বলল, আজ থেকে হরিমটর।

অন্যেরা বলল, আজ রাত না হয় উপোস করেই কাটিয়ে দেব, কাল থেকে কি হবে?

ওরা যখন এমন কথাবার্তা বলছে তখন ভীমভট্ট বলল, ভাই দুঃখ করো না। আমার টাকাকড়িতে প্রয়োজন নেই। তোমরা যে যার টাকা ফিরিয়ে নাও।

ওরা বলল, না বাজিতে হারা টাকা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

ভীমভট্ট বলল, এ ধন আমি স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দিতে চাইছি। এ ধন নিয়ে তোমরা আমার বন্ধু হও।

অক্ষক্ষপণক তখন বলল, ভাইসব, উনি যদি আমাদের বন্ধুই হন এবং স্বেচ্ছায় আমাদের সব অর্থ ফিরিয়ে দিতে চান, তবে ফিরিয়ে নিতে আপত্তি কোথায় ?

অন্যেরা বলল, না, উনি যদি সত্যিই আমাদের বন্ধু হন, তবে আর আপত্তি কোথায় !

এই বলে তারা তাদের হারা অর্থ ফিরিয়ে নিল। তারপর তারা সবাই মিলে গিয়ে এক উদ্যানে বসে খাওয়া দাওয়া করল। সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল সকলে।

মাঝরাতে তাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল প্রবল বর্ষণে। ওরা তাড়াতাড়ি কাছের এক বাড়িতে আশ্রয় নিল। প্রবল বর্ষণে ফুলে উঠল সমুদ্রের জল। সমুদ্রগামী নদীর জল উল্টো বইতে থাকল। দুপাড় ভেসে গেল জলস্রোতে। ওরা ভীমভট্টকে বলল, ভয় পেওনা বন্ধু। আমাদের দেশে বর্ষা এলেই এমন হয়। এ জল এখুনি নেমে যাবে।

সত্যি সত্যি বর্ষণ থামতে না থামতে জল নামা শুরু করল। আর লোকজন বেরিয়ে পড়ল ডাঙ্গায় আটকে যাওয়া মাছ ধরতে। ভীমভট্টর খুব ভাল লাগতে লাগল। মাঝরাতে আলো হাতে শত শত মানুষ নেমে পড়ছে। আলোগুলো দুলছে, চলছে নানান ছন্দে। ছেলে বুড়ো যুবক-যুবতী যারাই মাছ ধরতে নেমেছে তাদেরই উল্লাসে বাতাসে বইছে আনন্দের ঢেউ। সবার খুশীর ছোঁয়ায় ভীমভট্টও খুশি হয়ে উঠেছে।

এনন সময় মাঠের এক জায়গা থেকে দারুণ হৈ-হৈ উঠল। সকলে ছুটতে থাকল সেদিকে। ভীমভট্টর বন্ধুরা বলল, হয়ত বড় কোন মাছ উঠেছে। তাই অত চিৎকার।

কিন্তু তাদের সে অনুমানও ব্যর্থ হ'ল। চিৎকার চেঁচামেচি বেড়েই চলল। তখন ওদের কৌতূহল বাড়ল। ভীমভট্ট বলল, চল দেখা যাক ওখানে কি ঘটেছে।

সেখানে গিয়ে ওরাও হতবাক। সেখানে তিমি জাতীয় এক বিরাট মাছ। সমুদ্রের স্রোত যখন নদীতে ঢুকছিল তখন কোনক্রমে চলে এসেছিল মাছটি। জল সরে যেতে আটকে পড়েছে।

অক্ষক্ষপণক চেঁচিয়ে উঠল—ওর পেট কেটে ফেলে দেখা যাক ভেতরে কি আছে!

সকলে চিৎকার করে তাকে সমর্থন করল। কুমিরের পেট কেটে অনেক সময় সোনার গহনা পাওয়া যায়। দেখা যাক এটার পেটে কি আছে!

ছোট খাট অস্ত্রে ওর পেট কাটা গেল না। তখন কয়েকটা কুড়ুল এলো, তা দিয়ে চিরে ফেলা হ'ল মাছটার পেট। তার থেকে মস্ত এক চামড়ার থলের মত নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এলো। সেটা তখনও নড়ছে। ভীমভট্ট তার তলোয়ার চালিয়ে ভুঁড়িটি কেটে ফেলল। দেখা গেল তার ভেতর একটা জ্যান্ত মানুষ।

সকলে হৈ হৈ করে উঠল। এমন অবাক কাণ্ড কেউ কখনও দেখেনি। লোকটা তখনও বেঁচে। তাকে নানাভাবে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চলল। গরমজল দিয়ে স্নান করান হতেই ভীমভট্ট তাকে চিনতে পারল। লোকটি আর কেউ নয়, তারই বন্ধু শংখদত্ত। ভীম তাকে জড়িয়ে ধরল।

এই অত্যাশ্চর্য ঘটনায় সবাই কৌতূহলী হয়ে শংখ দত্তর কাছে সব ঘটনা জানতে চাইল। শংখদত্ত যা বলল, তা এই যে, ভীমভট্টর সঙ্গে সাঁতার কাটতে কাটতে জলস্রোতে হঠাৎ ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তারপর সে সাঁতরে ও পাড়ে যায়। শরীর দারুণ ক্লান্ত। নদীর পাড়েই শুয়ে থাকে। গভীর রাতে হঠাৎ বান এলে ভেসে যায় শংখ দত্ত। বোধ হয় সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেই সময় হঠাৎ এই মাছটা গিলে ফেলে তাকে।

মাছের পেটে গিয়ে তার মনে হয় নরকে এসে পড়েছে। চারদিকে কোথাও থৈ নেই। কি একটা নরম বিছানা তাকে চারদিক থেকে জড়িয়ে রেখেছে। নিশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়। তার সঙ্গে সারা গায়ে অসহ্য জ্বালা। মনে হতে থাকে তার প্রচণ্ড জ্বর হয়েছে। বোধ হয় তখন সে যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়েছিল।

ইতোমধ্যে মাছটি আটকা পড়ে ডাঙ্গায়। ওরা সকলে এসে পেট কেটে বের করে তাকে। সময়মত বের না করলে হয়ত' সে হজমই হয়ে যেত।

ভীমভট্ট বলল, না ভাই। তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে তা আমি নিশ্চিত জানতাম।

কি ভাবে? জিজ্ঞাসা করল শঙ্খদত্ত।

ভীমভট্ট তখন দেবী গঙ্গার আশীর্বাদের কথা বলল। অক্ষপণকেরা এসব কথা শুনে এত অভিভূত হ'ল যে তাদের এই নতুন বন্ধু এবং বন্ধুর বন্ধুকে ছাড়ল না। লাট দেশে একটা বাড়ি কিনে সবাই মিলে একত্রে বাস করতে থাকল।

তিন

লাট দেশে জাঁকজমকের সঙ্গে নাগরাজ বাসুকীর পুজো হ'ত। সেই উপলক্ষ্যে হ'ত বিরাট উৎসব। সেদিন রাজবাড়ির বাসুকী মন্দির খুলে দেওয়া হ'ত। খুলে দেওয়া হত মন্দিরের দক্ষিণদিকের মস্ত বড় হ্রদ। সবাই সেদিন সেখানে যেতে পারত। স্নান করতে পারত।

ভীমভট্ট তার বন্ধুদের নিয়ে সেদিন ঘুরছিলেন মন্দিরে, মন্দির প্রাঙ্গণে, হ্রদের পাড়ে পাড়ে। ঘুরে ফিরে যেন আশা মিটছিল না তাদের। এত সুন্দর চারিদিক!

মন্দিরে অর্ঘ্য দিল সবাই। বিগ্রহের গায়ে ফুলের মালা আর মালা। মনে হয় সাপ জড়ান আছে তাতে। সত্যিই যেন নাগরাজ। হ্রদে ফুটে আছে শত শত লাল পদ্ম। যেন শাপের মাথার মণি। তার পাশে

সবুজ পাতা যেন সর্প বিষের দ্যুতি নিয়ে ঝলমল করছে। আশ-পাশের গাছ থেকে ঝরে পড়ছে ফুল। যেন নাগরাজের নামে অঞ্জলি দিচ্ছে।

ভীমভট্ট যখন বন্ধুদের সঙ্গে হ্রদের তীরে ঘুরছিলেন তখন একদল সখি নিয়ে পুজোর আগে স্নান করতে যাচ্ছিলো, লাটরাজ চণ্ডাদিত্যের কন্যা হংসাবলী। ভীমভট্ট জীবনে এত সুন্দরী দেখেনি। মনে হচ্ছে যেন দেবকন্যা ভুলে মর্তে নেমে এসেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনকে সংযত করে অন্য দিকে ফিরে চলল ভীমভট্ট।

হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল, রাজকুমারী ডুবে গেছেন। রক্ষা কর। উদ্ধার কর তাকে।

চিৎকার শুনেই ছুটে গেল ভীমভট্ট। পদ্ম ফুল তুলতে গিয়ে নালে জড়িয়ে তলিয়ে যাচ্ছে রাজকন্যা। ভীমভট্ট মুহূর্তে ঝাঁপ দিল জলে। ডুব দিলে ছিঁড়ে দিল নালগুলি। রাজকন্যা ভেসে উঠল। আলতো করে ভাসিয়ে রাজকন্যাকে ঘাটে নিয়ে এলো সে। সখিরা তাদের ঘিরে ধরল। রাজকন্যা ভীমভট্টর দিকে তাকিয়ে বলল, কে আপনি দেব! আমাকে আপনি প্রাণ দিলেন।

ভীমভট্ট নিজের পরিচয় দিলেন। খুবই খুশি হল রাজকুমারী। বলল, রাজসভায় আপনার নিমন্ত্রণ রইল। আমি বাবাকে বলে রাখব।

ভীমভট্ট চলে এলো। সেদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল তার। মনে হ'ল এ সময়ে রাজকুমারীকে একবার দেখতে পেলে হ'ত! ভাবতেই মনে পড়ল গঙ্গাদেবীর শিখিয়ে দেওয়া মন্ত্রের কথা। সঙ্গে সঙ্গে অনুলোম মন্ত্র পড়তেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

অদৃশ্য ভীমভট্ট সব প্রহরীর চোখ এড়িয়ে প্রবেশ করল রাজপুরীতে। খুঁজে খুঁজে বের করল রাজকন্যার ঘর। এ কি! রাজকন্যা জেগে কেন? কি ভাবছে রাজকন্যা! ভীমভট্ট তার সামনে গিয়ে বলল, রাজকনা আমি এসেছি!

কে! চমকে তাকাল রাজকন্যা। কেউ তো কোথাও নেই।

কণ্ঠস্বর তো সেই যুবকের মত। তবে বোধ হয় তার কথা ভাবছিল বলেই মনে হয়েছে তার কণ্ঠস্বর। রাজকন্যা ভাবল, ভুলই শুনেছে।

ভীমভট্ট রাজকন্যার মুখের ভাব দেখে দুঃখ পেল। তবে কি সে আসায় রাজকন্যা অখুশী হয়েছে? সে বলল, রাজকন্যা, আমি আসায় তুমি কি অখুশী হয়েছ?

রাজকন্যা এবার বিস্মিত হ'ল। এবার তো সে ভুল শোনেনি। এ তো সেই যুবকেরই কণ্ঠস্বর। তবে সে কোথায়! এসেছি বলছে তবু দেখা যাছে না কেন? রাজকন্যা বলল, তুমি কোথায়? এসেছ যদি তবে তোমাকে দেখা যাছে না কেন?

ভীমভট্টর তখন মনে পড়ল, সেতো এখন অদৃশ্য আছে। তাড়াতাড়ি প্রতিলোম মন্ত্র পড়তেই সে দৃশ্য হয়ে গেল। রাজকুমারী খুব খুশি। তাড়াতাড়ি এক সখিকে জাগিয়ে ভীমভট্টর জন্য খাবারের আয়োজন করতে বলল। আর এক সখিকে দরজায় পাহারা দিতে বলে দুজনে গল্প করতে বসল। কত গল্প। ভীমভট্টর প্রতি সমরভট্টর আক্রোশের কথা শুনতে শুনতে হংসাবতী রাগে ফুঁসে উঠল। আবার সিংহদের সঙ্গে লড়াই-এর গল্প শুনতে শুনতে আতঙ্কে শিউরে উঠল। শঙ্খদত্তর মাছের পেট থেকে বের হবার কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হ'ল হংসাবতী। আবার মাছের পেট থেকে বের হবার পর শঙ্খদত্তর চেহারার বর্ণনা শুনতে শুনতে খিলখিল করে হেসে উঠল।

সে হাসির শব্দ গিয়ে পৌঁছাল অন্দরমহলের প্রতিহারিণীর কানে। এত রাতে রাজকন্যা হাসে কেন? গোপন পথে এসে রাজকন্যার দেওয়ালের ফুটো দিয়ে দেখে সে অবাক। রাজকন্যার ঘরে এক যুবক পুরুষ। ভাল করে দেখে সে চিনল, এই যুবকই তো রাজকন্যাকে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু সে রাজকন্যার ঘরে গেল কি করে?

প্রতিহারিণী কম বুদ্ধি ধরে না। সে গিয়ে আর একজন প্রতিহারিণীকে কি শিখিয়ে দিয়ে আবার ফুটোয় চোখ লাগল। দ্বিতীয় প্রতিহারিণী এসে রাজকুমারীর দরজার কড়া নাড়ল।

রাজকুমারী তাড়াতাড়ি ভীমভট্টকে লুকাতে বলল। ভীমভট্ট বলল, লুকোবার দরকার নেই। আমি অদৃশ্য হচ্ছি। এই বলে মন্ত্র পড়তেই সে অদৃশ্য হ'ল।

দরজা খুলতে প্রতিহারিণী বলল, কুমারী আপনার কি ঘুম আসছে না? আমরা কি রাজবৈদ্যকে সংবাদ দেব?

হংসাবলী বলল, না। আমার কিছুই দরকার নেই। শুধু বিরক্ত করো না।

প্রতিহারিণী প্রণাম করে চলে গেল। ভীমভট্ট আবার দৃশ্য হ'ল। কিন্তু আর বেশিক্ষণ থাকল না সে। অদৃশ্য হয়ে চলে গেল।

সবটাই ফুটো থেকে দেখল প্রতিহারিণী। বুঝল ভীমভট্ট খুব সাধারণ মানুষ নয়। রূপেগুণে রাজকুমারীর যোগ্য! এঁদের বিয়ে হ'লে মন্দ হয় না। গিয়ে সব কথা খুলে বলল মহারাজ চণ্ডাদিত্যকে।

চণ্ডাদিত্য ডেকে পাঠালেন মন্ত্রীকে।

মন্ত্রী ছুটলেন কোতোয়ালের কাছে। কোতোয়াল ডাকলেন প্রহরীদের। তারা বলল, যে, এক বিদেশী যুবক পাঁচ বন্ধু নিয়ে এক প্রাসাদ কিনে এ শহরে বাস করছে, এখবর তারা জানে। যুবকের বাসাও তারা চেনে।

—আমাকে নিয়ে চল সেই বাসায়।

মন্ত্রী বহুলোক লস্কর নিয়ে চললেন সেই প্রসাদের দিকে। গিয়ে তারা প্রাসাদ ঘিরে ফেলল।

শঙ্খদত্ত ঠেলা দিয়ে তুলল ভীমভট্টকে। বলল, সর্বনাশ। মন্ত্রী স্বয়ং লোক-লস্কর এনে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। কি করবে?

ভীমভট্ট হাসল। বলল, কাল আমরা একই রকম যে পোশাকগুলো কিনেছি তা সকলে পরে ফেল। তাড়াতাড়ি।

সেগুলো ওরা পরে ফেলল। তারপর এক এক জন এক এক দরজায় গিয়ে বলল, কি চাই! তোমরা প্রাসাদ ঘিরলে কেন?

সকলেই একই উত্তর পেল। প্রহরীদের সর্দারেরা বলল, আমরা ভীমভট্টকে চাই।

প্রত্যেকেই বলল, আমিই ভীমভট্ট।

প্রহরীরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে ফেলে মন্ত্রীর সামনে উপস্থিত করল। মন্ত্রী দেখলেন ছ' ছটি ভীমভট্ট। আসল নকল বাছাই করার সাধ্য হ'ল না তাঁর। তিনি ছ'জনকেই নিয়ে চললেন রাজদরবারে।

যেতে যেতে তিনি বললেন, এ তো ভারি বিপদে পড়লাম। রাজা তো এক ভীমভট্টর সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিতে চান। এখন ছ' ভীমভট্ট নিয়ে কি করি!

রাজদরবারের কাছে এসে আরও বিপদ। যতই গোনেন ছ' ভীমভট্ট আর মেলে না। গাড়িতে ভীমভট্ট পাঁচটি। তিনি কোতোয়ালকে বললেন, কটি তুলেছিলেন?

কোতোয়াল বলল, আজ্ঞে ছ'টি।

মন্ত্রী বললেন, তা হ'লে পাঁচটি হ'ল কি করে? একটি কি উবে গেল?

কোতোয়াল মাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে পাঁচটিই তুলেছিলাম। তখন আপনাকে নিয়ে ছয় বলেছি।

আমাকে নিয়ে! চোখ পাকালেন মন্ত্রী! আমি নিজেও কি আমাকে নিয়ে ছয়গুণে ছিলাম! প্রহরী! ধর ব্যাটাকে! ওকেই ভীমভট্ট সাজিয়ে ছয় ভীমভট্ট দরবারে নিয়ে যাব।

সত্যি সত্যি গোঁফ কামিয়ে ফেলে, প্যান্টুল খুলিয়ে, পাগড়ি ছাড়িয়ে কোতোয়ালকে আর এক ভীমভট্ট সাজিয়ে ছয় ভীমভট্ট নিয়ে মন্ত্রী এগুতে থাকলেন রাজসভার দিকে।

এদিকে রাজসভা বসতে না বসতে সেখানে এক বিশাল দেহ সুপুরুষ এসে উপস্থিত। সে এসে আভূমিনত হয়ে প্রণাম করে বলল, মহারাজ আমি পাটলিপুত্র রাজের দৌহিত্র, রাধারাজের পুত্র। নাম ভীমভট্ট। আমি সিংহ-অধ্যুষিত শর অঞ্চল পার হয়ে এসেছি। প্রবলস্রোতা গঙ্গা পার হয়েছি সাঁতরে। দেবী গঙ্গাকে তুষ্ট করে অনুলোম প্রতিলোম মন্ত্র লাভ করেছি। তার বলে আমি অদৃশ্য এবং পুনঃ দৃশ্য হতে পারি। নাগরাজ

বাসুকী পূজার দিন রাজকন্যা হংসাবলী ডুবে যাচ্ছিলেন। আমি তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে অঙ্গ স্পর্শ করেছি। তাই মহারাজের কাছে ঐ কন্যার পাণি প্রার্থনা করছি। আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলে বাধিত হই।

রাজা চণ্ডাদিত্য ভীমভট্টকে দেখে এবং তার কথা শুনে এত মোহিত হলেন যে নিজে সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাকে আলিঙ্গন করলেন। সেই ফাঁকে কানে কানে বললেন, নির্বোধ, এ না করে গোপনে রাজকন্যার কক্ষে গিয়েছিলে কেন?

ভীমভট্টও গোপনে বলল, অন্যায় করেছিলাম। আপনি মার্জনা করুন।

ঠিক এই সময়েই ছয় ভীমভট্টকে নিয়ে মন্ত্রী প্রবেশ করলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, কি মন্ত্রীবর আপনার সংবাদ?

কাঁদ কাঁদ মুখে তিনি বললেন, সংবাদ অশুভ। এক ভীমভট্টের বদলে ছয় ভীমভট্ট পেয়েছি। আসল নকল চিনতে পারছি না।

রাজা বললেন, আসলটি আমি পেয়ে গেছি ওসব কটিই নকল।

মন্ত্রী এত বড় হাঁ করে বললেন, অ্যাঁ!

কোতোয়াল গোঁফে হাত বুলাতে বুলাতে হুঃ হুঃ করে কেঁদে উঠ্‌ল।

*　　*　　*

এরপর? এরপর গল্প ছোট্ট। খুব জাঁকজমকের সঙ্গেই আসল ভীমভট্টর সঙ্গে হংসাবলীর বিয়ে হ'ল। মন্ত্রীমশাই এবার আর অনেক ভীমভট্টের হাটে নাজেহাল হলেন না। আবার গোঁফ গজাতে কোতোয়াল মশাইএর দুঃখ কমে গেল।

তারপর বৌ আর বন্ধুদের নিয়ে পাটলিপুত্রে গেল ভীমভট্ট। দাদু সমাদরে নাতি-নাতবৌকে ঘরে তুলে নিলেন। নাতির হাতে রাজ্য তুলে দিয়ে তিনি গেলেন তপস্যা করতে। চণ্ডাদিত্যের রাজ্যও তিনি তুলে দিনের জামাই-এর হাতে। নীলকণ্ঠ এসে নিল পাটলি পুত্রের মন্ত্রীত্ব। শঙ্খদত্ত হ'ল প্রধান সেনাপতি। সেই দ্যূতশালার বন্ধুরাও যোগ্যমত স্থান পেল।

এমন সময় সংবাদ এলো রাজা উগ্রভট্ট পরলোকগমন করেছেন। ভীমভট্ট বাবার পারলৌকিক কাজ করে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য যাত্রা করল। যে মাঠে এক দিন শ্বেত অশ্ব নিয়ে যুদ্ধ হয়েছিল, সেখানেই আবার যুদ্ধ হ'ল। সমরভট্ট ভীষণভাবে হেরে গেল। এবারেও শঙ্খ-দত্ত তার চুলের মুঠি ধরে কাটতে গেল। বাধা দিল ভীমভট্ট। বল্‌ল, ছেড়ে দাও ওকে ছেড়ে দাও। শত অপরাধ করলেও ও আমার ছোটভাই।

সমরভট্ট দু হাত বাড়িয়ে দিল। বল্‌ল, দাদা! আমাকে ক্ষমা কর।

ভীমভট্ট তাকে জড়িয়ে ধরল। বল্‌ল, তুই আমার বুকে আছিস। অনিষ্ট কর দেখি!

কেঁদে উঠ্‌ল সমরভট্ট। বল্‌ল, দাদা, অনিষ্ট যা হবার তা আগেই হয়ে গেছে। অস্ত্রের আঘাতে আমার দু চোখই অন্ধ হয়ে গেছে।

ভীমভট্ট বল্‌ল, সে কি। কিভাবে এ হ'ল ভাই!

সমরভট্ট বল্‌ল, আমারই পাপে দাদা। ঈর্ষার আগুনে তোমাকে পোড়াতে চেয়েছিলাম। পুড়েছি আমি। দেখি এখন তোমার স্নেহে ঈর্ষা দূর হয় কিনা। আর আমার কপালে শান্তি আসে কি না।

ভীমভট্ট ওর চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলতে থাকলেন, আসবে, নিশ্চয় শান্তি আসবে ভাই।

দারু পুত্তলিকার কথা

হস্তিনাপুরে শিবদত্ত নামে এক সজ্জন ব্রাহ্মণ বাস করতেন। কিন্তু জীবনে তাঁর শান্তি ছিল না। এ অশান্তির মূলে ছিল তাঁর স্ত্রী। সে রূপসী হলেও ছিল যেমন হিংসুটে, তেমনি রাগী। রাগ হলে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এ নিয়ে সারা জীবন জ্বলতে হয়েছে শিবদত্তকে।

এদের একটি মাত্র সন্তান ছিল—এক ছেলে। নাম বসুদত্ত। মায়ের ব্যবহারে পাছে ছেলের স্বভাব বিগড়ে যায় তাই শিবদত্ত অতি শৈশবেই ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন গুরুগৃহে। সে সেখানে শুধু বেদ-ব্যাকরণ শাস্ত্রই পাঠ করল না, অস্ত্র বিদ্যাতেও পারদর্শী হয়ে উঠল। আর তাই বিদ্যাভ্যাস শেষ করে বাড়ি ফিরতেই কাজ পেয়ে গেল রাজদরবারে। বাবা শিবদত্ত অনেক দেখেশুনে ছেলের যোগ্য কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। ছেলের বিয়ের পর একদিন শিবদত্তকে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া গেল না। শুধু শিবদত্তের স্ত্রী ব্যাপারটা জানল। সে বিছানায় এক পত্র পেল, পত্রে লেখা ছিল,

> তোমারই জন্য আমি গৃহত্যাগ করলাম। তুমি আমার সারা জীবন দগ্ধ করেছ। কিন্তু তখন গৃহত্যাগ করতে পারি নি। কে দেখবে তোমাকে? এখন উপযুক্ত পুত্র রইল। পুত্রবধূ রইল। আমার গৃহত্যাগ থেকে যদি তুমি শিক্ষা গ্রহণ করতে পার, তবে তোমার জীবন সুখেই কাটবে। আর যাই কর বসুদত্তর জীবন বিষময় করে দিও না।

চিঠি পড়ে শিবদত্তর স্ত্রীর ভেতরটা জ্বলে গেল। পেলে হ'ত লোকটাকে। বলে কিনা, আমি তার জীবন জ্বালিয়েছি। আমি ছেলের জীবন জ্বালাব! আমি হেন শান্ত মানুষ মিলবে কোথায়? আমি মুখ

ফুটে একটা কথা বলি না কাউকে। সব দুঃখ মুখবুজে সহ্য করি! আর আমাকে বলে কিনা, আমি জীবন জ্বালিয়েছি! মুখে আগুন অমন লোকের।

এ পত্রের কথা কাউকেই বল্‌ল না শিবদত্তর বৌ। কিন্তু হাড়ে হাড়ে চটে রইল সকলের ওপর। বসুদত্তের বৌকে দেখেই বল্‌ল, এই যে বড় মানুষের বেটী! উঠলেন এতক্ষণে ঘুম থেকে।

মেয়েটি বল্‌ল, কেন মা! আমি তো অনেকক্ষণ ঘুম থেকে উঠেছি।

সে বল্‌ল, আহা তাই তো বলছি বাছা! অত আগে উঠে সোনার অঙ্গ কালি করবে কেন? আরও বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকলেই তো পারতে। কাজ কাম সারা হলে উঠ্‌লেই তো চলত!

বৌটি বল্‌ল, মা, আমি তো বুঝতে পারছি না কি অপরাধ করেছি। আপনি দেখিয়ে দিন. আমি শুধরে নেব!

শ্বাশুড়ী বল্‌ল, তোমার অপরাধ হবে কেন বাছা! অপরাধ আমার। তোমার সঙ্গে কথা বলাটাই তো আমার অপরাধ। এ সব জেনে শুনেও যে কেন কথা বলতে যাই! এ আমার কপাল। না হলে এ সময় তোমার শ্বশুর মশাই বা গৃহত্যাগ করবেন কেন! কপাল বাছা, কপাল। বলে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

বৌটি হতবাক হয়ে গেল। ফিরে গেল ঘরে। বসুদত্তকে খুলে বলল সব। বসুদত্ত বল্‌ল, আমি জানি মায়ের স্বভাব। আমার মা একটু হিংসুটে, মুখরা। তুমি একটু সমঝে চলবে। পারতপক্ষে উত্তর দেবে না।

স্বামীর এ উপদেশেও বিপদে পড়ল বৌটি। শাশুড়ীর কথায় উত্তর দিল না বৌটি। তাতেও চটে গেল শিবদত্তের বৌ। বলল, আমার কথায় উত্তর দেবে কেন? আমার সঙ্গে কথা বললে যে বড়লোকের বৌটির মান যায়। ঘেন্না হয়।

মেয়েটি অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। যা উত্তর দেয় তাতেই শাশুড়ী দোষ ধরে। কাঁদলে, বলে, ন্যাকামি। হাসলে বলে, কি! আমাকে নিয়ে হাসাহাসি! বোঝাতে গেলে বলে, আমাকে বোকা পেয়েছ! আমি

নির্বোধ! এই সব বলে আর কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে আত্মীয় স্বজনকে নিজের মত করে লাগায়—বৌ এই করেছে, ঐ করেছে।

লোকে বলে, ছি, ছি! এই নাকি বৌএর ব্যবহার।

বৌ এসে কেঁদে পড়ে বসুদত্তর কাছে। কিছু না করেও আমি অপরাধী হয়ে রইলাম! সকলে আমাকে যা তা বলবে!

বসুদত্ত বল্‌ল, মানিয়ে নাও।

বৌ বল্‌ল, আর কত মানাব!

বসুদত্ত বল্‌ল, উপায় কি বল! মাকে তো আর তাড়িয়ে দিতে পারি না!

বৌ চুপ করে গেল। কিন্তু একদিন আর সহ্য হল না বৌএর। সে বাড়ী ছেড়ে কোথায় চলে গেল, তাকে আর পাওয়া গেল না। শাশুড়ী বল্‌ল, যাবে না! অমন দজ্জাল বৌ ঘর করতে পারে! আমাকে মারতে বাকি রেখেছে! আমি হেন শাশুড়ী তাই এতদিন ঘর করতে পেরেছি।

মায়ের ব্যবহারে বসুদত্তের মন একেবারে ভেঙ্গে গেল। তারও আর সংসারে থাকতে ভাল লাগল না। কিন্তু তার মনের সংবাদ কেমন করে জেনে ফেলল তার আত্মীয়স্বজন। তারা বল্‌ল, বৌএর শোকে তোমারও গৃহত্যাগ করা চলবে না। তা হলে তোমার মাকে দেখবে কে?

মায়ের জন্যই যে বৌ গৃহত্যাগ করেছে এ কথাটা বসুদত্ত তাদের বলতেই পারল না। বললেও মানতনা তারা। এ কারণেই চুপ করে রইল সে। আত্মীয়েরা জোর করে তার আর এক বিয়ে দিল।

এবারেও কিন্তু শাশুড়ী বৌএ বনিবনা হ'ল না। অবশেষে দ্বিতীয় বৌ একদিন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল।

এবারেও আত্মীয়-স্বজনেরা প্রকৃত সত্য বুঝল না। বসুদত্তকে এবারেও গৃহত্যাগ করতে দিল না। তারা তার এক বিয়ের চেষ্টা করতে থাকল।

বসুদত্ত এবার চিন্তা করল যে, একটার পর একটা মেয়েকে এই নরক যন্ত্রণার মধ্যে এনে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়া পাপ। কি করে

আত্মীয়-স্বজনকে প্রকৃত ব্যাপারটা বোঝান যায়! হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি এল।

হঠাৎ সে একদিন সুন্দর সাজগোজ পরা একটি মেয়েকে হাত ধরে গাড়ি থেকে নামাল। তারপর প্রায় কোলে করেই নিয়ে গেল ঘরে। একটু পরে বাইরে আসতেই মা তাকে জিজ্ঞাসা করল, ও কাকে ঘরে আনলি?

বসুদত্ত বল্‌ল, তোমার বৌমা!

বৌমা!

বসুদত্ত বল্‌ল, হ্যাঁ। আমি আবার বিয়ে করেছি।

মা বল্‌ল, তা, অমনি করে ঘরে ঢোকালি কেন?

ও খুব লাজুক মা! থাক কিছু দিন একা একা ক্রমে তোমার সঙ্গে পরিচয় হবে।

কিন্তু কেমন বৌ, কি করে, কেমন তার ভাবভঙ্গি দেখবার জানবার জন্য মনের কৌতূহল আর দমন করে রাখতে পারে না বসুদত্তর মা। সে উঁকি ঝুঁকি মারে। দেওয়ালে কান পাতে। কিন্তু না দেখা যায় কিছু, না শোনা যায়!

বসুদত্ত ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে যায়। আর তার মা ঘরের চারদিক দিয়ে ঘুরতে থাকে। বৌকে নানা ধরনের খোঁচা দেওয়া কথা শোনায়। কিন্তু তবু তো ভেতর থেকে উত্তর আসে না! রাগে দরজায় দমাদম কিল মারে সে। তাতেও সাড়া নেই।

হঠাৎ একদিন বসুদত্ত একটা জানালা বন্ধ করতে ভুলে গেল। সে বাইরে যেতেই তার মা, সেই জানালা দিয়ে উঁকি দিল। ঐ তো বিছানায় শুয়ে আছে বৌ। তার শাড়ির প্রান্তটুকু দেখা যাচ্ছে। খানিক ডাকাডাকি করল বসুদত্তর মা। তারপর শুরু করল নানা খোঁচা দেওয়া কথা।

কিন্তু তাতেও তো নড়ে না বৌ! বৌ কি কালা না বোবা! রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারা হয়ে গেল বসুদত্তর মা। আচ্ছা, তোর মজা দেখাচ্ছি। বলে সে দৌড়ে গিয়ে এক খণ্ড ইঁট তুলে নিয়ে মারল নিজের কপালে। কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে থাকল। সেই অবস্থায় সে চেঁচাতে থাকল, বাবা গো! মা গো! মেরে ফেল্‌ল! কে আছ বাঁচাও!

সেই চিৎকার শুনে ছুটে এলো সবাই। জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে? কে এই দশা করল!

বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল, কে আবার করবে। তোমরা তো ভাব, একের পর এক বৌ বুঝি আমিই তাড়াই। এই দেখ, বৌ আমার কি অবস্থা করেছে।

সকলে চোখ কপালে তুলে বল্‌ল, বৌ! বসুদত্ত আবার কবে বিয়ে করল?

বুড়ি বল্‌ল, সে আর বল কেন! কদিন আগে সন্ধ্যেবেলা কাকে কোলে করে ঘরে ঢুকিয়ে বসুদত্ত বল্‌ল, আবার বিয়ে করলাম। বৌ দিন রাত ঘরে থাকে। আমাকে সাহায্য ও করে না। কিছু না। শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি রেঁধে মরতে হয় আমাকে। আজ তাড়াতাড়ি গরম ভাত রেঁধে দিতে বলেছিল। তা পারি নি বলে ঐ জানালা দিয়ে ইঁট ছুঁড়ে মেরেছে।

সব শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল সবাই। তখুনি ডেকে আনা হ'ল বসুদত্তকে। সব শুনে সে বল্‌ল, মা, তুমি সত্যি বল্‌ছ বৌ ইঁট মেরেছে।

তবে কি মিথ্যা বল্‌ছি।

কিন্তু আমি যাকে বৌ বলে ঘরে এনেছি, তার পক্ষে ত' ইঁট মারা সম্ভব নয়।

আত্মীয়রা বল্‌ল, কি! সামনে তোমার মায়ের রক্তঝরা কপাল দেখেও এ কথা তুমি বলতে পারছ!

বসুদত্ত বল্‌ল, হ্যাঁ বলছি। মা যে কত বড় মিথ্যা বলছে, তা দরজা খুললেই আপনারা বুঝবেন। এমনি করে মিথ্যা বলেই আমার আগের দুই বৌ সম্পর্কে মা আপনাদের ভুল বুঝিয়েছেন। সেদিন আমি কিছু বলতে পারিনি। কারণ মা যে মিথ্যা বলছে তা আপনারা বিশ্বাস করতেন না। আজ দেখুন।

বলে বসুদত্ত তার ঘরের তালা খুলে ফেল্‌ল। সকলে ঘরে ঢুক্‌ল। বসুদত্ত এক হাতে টান দিয়ে তার ঘুমন্ত বৌকে দাঁড়া করিয়ে দিল। সকলে অবাক হয়ে দেখ্‌ল একটা মেয়ের মাপের একটা কাঠের পুতুলকে কাপড় পরিয়ে বৌ সাজিয়ে রাখা হয়েছিল।

সকলে বল্‌ল, বৌ কি ! এ যে কাঠের পুতুল !

বসুদত্ত বল্‌ল, হ্যাঁ। কাঠের পুতুলকে বৌ সাজিয়ে এনেছিলাম বলেই কোলে করে আনতে হয়েছিল। আর এ জন্যই সন্ধ্যায় বাড়ি এনেছিলাম। এ বৌ এর পক্ষে ইঁট ছোঁড়া সম্ভব নয়।

সকলে তখন হৈ হৈ করে ছুটে গেল তার মায়ের দিকে। কিন্তু তার আগেই সে পালিয়েছে। তাকে আর পাওয়া গেল না।

এবার আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে বসুদত্ত সুখে জীবন কাটাতে লাগল। তার গুণে রাজার দরবারে তার ক্রমেই উন্নতি হতে থাকল।



জীমূতবাহনের কথা

এক

অনেক অনেক কাল আগে হিমবৎ নামে এক পাহাড়ের অধিত্যকায় কাঞ্চনপুর নামে এক নগর ছিল। যেখানে রাজত্ব করতেন জীমূতকেতু নামে এক রাজা। এই রাজার উদ্যানে ছিল এক কল্পতরু। এই কল্পতরুর কাছে প্রার্থনা করে রাজা এক পুত্রলাভ করেছিলেন। তিনি তার নাম রাখেন জীমূতবাহন।

রাজার ঘরে জন্মেও জীমূতবাহনের বিলাস ব্যাসনে মন ছিল না। সে ছিল উদার অথচ গম্ভীর। প্রিয়ভাষী অথচ চিন্তাশীল সে সকলেরই আনন্দ এবং গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

সে যখন যুবরাজপদ পেল, তখন মন্ত্রীরা এসে তাকে বলল, যুবরাজ! আমাদের সকল ইচ্ছা পূরণ করবার মত এক বৃক্ষ আছে—এটি এই রাজবংশের পুরুষানুক্রমিক সম্পদ। এর বলে আমরা অজেয় এবং প্রার্থনামাত্রে আমাদের প্রার্থনা পূরণ হয়।

শুনে জীমূতবাহনের মুখ উজ্জ্বল হ'ল আবার কালোও হয়ে গেল।

মন্ত্রীরা এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না। তারা গিয়ে বলল রাজাকে। রাজা যুবরাজকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। কল্পতরুর কথা শুনে তোমার মুখ প্রথমে উজ্জ্বল এবং পরে কালো হ'ল কেন?

জীমূতবাহন বলল, বাবা এমন এক সম্পদ যে বংশে আছে, সেই বংশে জন্মেছি জেনে আমার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যখন ভাবলাম যে এমন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা পূর্বপুরুষেরা এ বৃক্ষের কাছে এমন কিছু চান নি, যাতে সারা পৃথিবীর সকলের মঙ্গল হয়, তখন আমার মুখ দুঃখে কালো হয়ে গেল।

রাজা বললেন, বাবা, প্রত্যেকেই নিজ বুদ্ধি মত কাজ করেন এবং বংশের সেই পুরুষের জন্মের জন্য প্রতীক্ষা করেন যিনি এসে নিজের কাজের দ্বারা নিজেকে এবং সেই সঙ্গে বংশকে সমুন্নত করবেন। কল্পতরুর কৃপায় তুমি যদি সেই বংশধরই হয়ে থাক, তবে যাতে তোমার এবং বংশের দুয়েরই উপকার হয়, তেমন কাজ কর।

জীমূতবাহন বল্‌ল, বাবা, এ পৃথিবীতে সুখ স্বাস্থ্য সম্পদ সবই ক্ষণস্থায়ী—নশ্বর। থাকে না কিছুই। আমরা যদি এমন কিছু করতে পারি যাতে সকলের উপকার হয়, তবে তা করাই কি ভাল নয়?

রাজা বললেন, তোমার চিন্তায় আমার পূর্ণ আস্থা আছে। বিশেষতঃ তুমি এখন যুবরাজ। তুমি স্বাধীন ইচ্ছামত কাজ কর।

বাবার অনুমতি পেয়ে জীমূতবাহন কল্পতরুর কাছে গিয়ে বল্‌ল, হে বৃক্ষ অধিষ্ঠিত দেবতা! তুমি পুরুষানুক্রমে আমাদের বংশের মঙ্গল কামনা ও ইচ্ছাপূরণ করে এসেছ। কিন্তু আমি তোমার এই শক্তিকে বিশ্বের সমস্ত মানুষের কাজে লাগাতে চাই।

বৃক্ষদেবতা বল্‌লেন, জীমূতবাহন! তুমি যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছ, তা মহৎ মানুষের পক্ষেই সম্ভব। তবে এমন কোন ইচ্ছাপূরণ করলে আমি আর তোমাদের এ উদ্যানে থাকব না। আমি আছি বলে তোমাদের রাজবংশ অজেয় আছে। আমি চলে গেলে কিন্তু শত্রুর আক্রমণে রাজ্যরক্ষা অসম্ভব হবে।

জীমূতবাহন বলল, হে দেব! বহু জনের মঙ্গলের জন্য নিজে দুঃখ-বরণ করার চেয়ে সুখ পৃথিবীতে আর কি আছে?



বৃক্ষদেবতা বললেন, বেশ! বেশ! তুমি যদি সে দুঃখ বরণে প্রস্তুত থাক তবে বল তোমার প্রার্থনা!

জীমূতবাহন বলল, হে দেব! যদি তুমি আমার ইচ্ছা পূরণ করতে চাও তবে এমন কিছু কর, যাতে পৃথিবীতে দারিদ্র্য না থাকে। পৃথিবী সম্পদে পূর্ণ হয়।

কল্পতরু বললেন, তাই হবে জীমূতবাহন। পৃথিবীর গর্ভ নানা সম্পদে বোঝাই হবে। পৃথিবী হবে সম্পদশালিনী। সমস্ত মানুষ ভাগ করে ভোগ করলে পৃথিবীতে দারিদ্র্য থাকবে না। সব মানুষ ধনী হয়ে যাবে।

এই বলে কল্পতরু অদৃশ্য হয়ে গেল। পৃথিবী এত ঐশ্বর্যে পূর্ণ হ'ল যে সেই কালে আর দারিদ্র্য রইল না। আর এই অভাবিত কান্ড যে জীমূতবাহনের জন্যই ঘটেছে তা প্রচার হওয়ায় সকলেই তার জয়ধ্বনি দিতে থাকল।

কিন্তু সোনা ব্যাঙ যতই মক মক করে কুনে ব্যাঙকে ডাকুক, সে ডাক গিয়ে পৌঁছায় ঢোঁড়া সাপের কানে। লোকের এই প্রশংসাও তেমনি কাঞ্চনপুরের শত্রুদের কানভারী করে তুলল। এর ওপর তারা যখন শুনলেন যে কল্পতরু উধাও হয়েছে, তখন তারা জয়ডঙ্কা বাজিয়ে সৈন্য-সজ্জা করতে থাকলেন।

গুপ্তচর এসে এ সংবাদ দিল রাজাকে। রাজা জীমূতকেতুও মন্ত্রীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। সেনাপতি নতুন উদ্যমে যুদ্ধায়োজন শুরু করলেন। এ সংবাদ প্রজাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে, তারাও উত্তেজিত হয়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, জীবন দেবেন তবু এই রাজবংশের গায়ে তারা হাত দিতে দেবেন না।

এ সব সংবাদ এক সময় জীমূতবাহনের কানেও গেল। সে এসে বাবাকে বলল, বাবা! এ যুদ্ধায়োজন বন্ধ করুন।

কেন?

কি হবে এই যুদ্ধে! আপনি বা আমি সিংহাসনে না বসে আর একজন বসলে পৃথিবীর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে? তাতে কি সূর্য ওঠা বন্ধ হবে না সমুদ্রের জোয়ারভাটা খেলবে না? শুধু ঐ সিংহাসনের জন্য শত শত সাধারণ মানুষ প্রাণ দেবে! বাবা, এ রাজ্য না থাকলে, পৃথিবী কি এতই কৃপণ যে আমার আপনার বা মায়ের খাবারটুকুও বন্ধ করে দেবে? তার চেয়ে চলুন রাজ্য ছেড়ে আমরা চলে যাই। তীর্থে তীর্থে ঘুরে আমাদের জীবন কাটবে আনন্দে, মন হবে সর্বকলুষমুক্ত।

রাজা বললেন, বাবা! আমি এবং তোমার মা এখন যে বয়সে পৌঁছেছি, তাতে তীর্থই আমাদের সার। এখন ভোগ-বিলাসের সময় তোমার। তুমি যদি রাজ্যত্যাগে খুশি হও, আমাদের দ্বিধা কোথায়?

জীমূতবাহন বলল, তবে তাই হোক বাবা! চলুন আমরা রাজ্য ছেড়ে চলে যাই অরণ্যবাসে।

রাজ্য ছেড়ে অরণ্যবাসে চলে গেলেন জীমূতবাহন। সঙ্গে গেলেন বাবা আর মা। মলয় পর্বতে চন্দন গাছের ছায়ায় ঘেরা এক পার্বত্য নদীর তীরে এক ছোট্ট কুঠির নির্মাণ করে তিনজনে বাস করতে থাকলেন

সেখানে। শাস্ত্রপাঠ, ধর্ম-আলোচনা এবং স্বল্পশ্রমে নিজের আহার্য নিজে সংগ্রহ করে দিন কাটাতে থাকলেন সকলে। রাজা-রাণী বললেন, সত্যিই জীমূতবাহন, রাজ্যে এত সুখ পাইনি।

এ কথা শুনে খুশীতে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল জীমূতবাহনের মুখ।

মলয় পর্বত ছিল সিদ্ধ নামে এক জনমণ্ডলীর রাজা বিশ্বাবসুর রাজত্বে। বিশ্বাবসুর পুত্রের নাম ছিল মিত্রাবসু। সে একদিন মৃগয়া করতে এসে জীমূতবাহনের সামনে পড়ে গেল। দেবতুল্য রূপবান এই যুবক কে? কিই বা করে এখানে!

জীমূতবাহন আত্মপরিচয় দিলেন। তা শুনে মিত্রাবসু বলল, আপনার কথা আমরা জানি। সর্ব-সাধারণের জন্য আপনার মমতার কথা কে না জানে। ধন্য আপনি। আপনার দর্শন পেয়ে আমিও ধন্য। আরও ধন্য হব যদি আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেন।

জীমূততাহন বুকে জড়িয়ে ধরল তাকে। বলল, বন্ধুলাভ জীবনে সৌভাগ্য। তবে আমার বন্ধু হতে গেলে মৃগয়ার নামে অকারণ পশু-হত্যা বন্ধ করতে হবে।

করব।

তবে চল। আমার বাবা মার কাছে।

চল!

দুই বন্ধু কখন আপনির গণ্ডি পেরিয়ে তুমিতে চলে এসেছিল, তা তাদের খেয়াল ছিল না। জীমতকেতুর কুটিরে এসে তাদের মিষ্টি ব্যবহারে, সরল জীবনযাত্রায়, ফলমূল আহারে এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল মিত্রাবসু। রাজপ্রসাদে মা-বাবাকে এমন করে পাওয়া যায় না। এত সহজ অন্তরঙ্গতাও সেই। সন্ধ্যায় তার আর ফিরতে মন চায় না। তবু ফিরে গেল সে।

প্রাসাদে ফিরে বাবাকে সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা খুলে বলল সে। বাবা বললেন, মিত্রাবসু! তুমি মহাভাগ্যবান যে ওঁদের দেখা পেয়েছ। ওঁদের মত মানুষের স্পর্শেই পৃথিবী পবিত্র হয়। তুমি কাল গিয়ে প্রস্তাব কর

যে, আমি আমার একমাত্র কন্যা মলয়বতীকে জীমূতবাহনের হাতে সম্প্রদান করতে অভীপ্সু। যদি রাজা জীমূতকেতু এ প্রস্তাবে সম্মতি দেন, আমি ধন্য হব।

পরদিন প্রভাতেই ছুটল মিত্রাবসু! বন্ধু জীমূতবাহনকে আত্মীয় হিসাবে পেতে তার আগ্রহও কম নয়। গিয়ে সে জীমূতকেতু এবং তাঁর স্ত্রী কনকবতীকে প্রণাম করল। কনকবতী তার চিবুক স্পর্শ করে চুমু খেয়ে বললেন, কি বাবা! প্রাসাদে মন টিকল না! ভোর না হতেই ছুটে এসেছ!

মিত্রাবসু বলল, না মা! শুধু নিজের টানে ছুটে আসিনি, আমার বাবা আমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা, আমার বোন মলয়বতীকে বন্ধুর হাতে অর্পণ করবেন। তিনি আপনাদের অনুমতি চেয়েছেন।

জীমূতকেতু বললেন, বাবা! আমরা রাজ্যহারা মানুষ। আমার পুত্র অরণ্যবাসী আধা-সন্ন্যাসী। এমন বংশে এবং এমন পাত্রে রাজকন্যা সম্প্রদান কি সুখের হবে! জেনো, তোমার বাবা যে প্রস্তাব করেছেন, তা আমাদের কাছে সৌভাগ্য। কিন্তু—

মিত্রাবসু বলল, আপনি দ্বিধা রাখবেন না। আমার বন্ধুর মত উদারমনা পুরুষকে স্বামীরূপে পেয়ে যে মেয়ে ধন্য না হয় তার জীবনে ধিক্‌। আমি বলছি, আমার বোন, আমারই মত এ জীবনে রাজপ্রাসাদ থেকে সুখে থাকবে।

জীমূতকেতু বললেন, তবে রাজ-ইচ্ছা পূরণ হোক।

মিত্রাবসু তাঁদের পদধূলি আবার নিয়ে ছুটলেন রাজপ্রাসাদে। শুভ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে আনন্দের সীমা রইল না। প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় বিবাহের দিন এসে গেল। অবশেষে জীমূতবাহনের সঙ্গে মলয়বতীর বিবাহ হয়ে গেল।

শ্বশুর, শাশুড়ীর সঙ্গে মলয়াবতী মলয় পর্বতের সেই অরণ্যবাসে আরও একটি কুটির নির্মাণ করে বাস করতে থাকল।

দুই

বিয়ের পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। রোজ বিকেলে মিত্রাবসু আসে বন্ধুর বাড়িতে। সকলে মিলে খানিক গল্পগুজব হয় তারপর কোনদিন বা দুই বন্ধু এবং মলয়বতী একত্রে বেরিয়ে পড়ে কোন দিন বা শুধু দুই বন্ধু। মলয়বতী সঙ্গে থাকলে অনেক দূর যাওয়া হয় না। যে দিন শুধু দুই বন্ধু থাকে সেদিন চলে যায় অনেক অনেক দূর।

এমনভাবে একদিন মলয়পর্বতে বেড়াতে বেড়াতে দুই বন্ধু এসে পেঁছাল এক নির্জন স্থানে। সেখানে এক পাশে এক সাদা পাহাড়। যেন হাড় দিয়ে তৈরী! কাছে আসতে দেখা গেল 'যেন-হাড়' নয় সত্যিকারের হাড়। জীমূতবাহন জিজ্ঞাসা করল, কিসের হাড় ভাই? এত হাড়ই বা কেন?

শুনে মিত্রাবসু বলল, এতদিন মলয় পর্বতে আছ, এ সম্পর্কে জান না?

জীমূতবাহন বলল, না।

মিত্রাবসু বলল, তবে শোন সংক্ষেপে বলি। পুরাকালে মহর্ষি কশ্যপের ছিল দুই স্ত্রী কদ্রু এবং বিনতা। কদ্রুর ছিল এক হাজার সন্তান। এরা ছিল সাপ। আর বিনতার ছিল দুই পুত্র। এক পুত্রের জন্ম অসময়ে হওয়ায় ছিল অপূর্ণ দেহ। মায়ের অধৈর্যেই তাকে অমন অপূর্ণ হতে হয়েছিল। তাই সে মাকে অভিশাপ দিয়েছিল যে, তিনি মনে মনে যখন কদ্রুকে অত হিংসা করেন, তখন তাঁকে দীর্ঘকাল তার দাসীত্ব বরণ করতে হবে। এই পুত্র সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে চলে যায়। সূর্যদেব তাকে সারথি করে নেন। এই সারথি আজও কাজ চালাচ্ছে। এঁর নাম অরুণ।

এদিকে একদিন কদ্রু এবং বিনতা এক বাজী ধরল। ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবার বর্ণ কেমন, এই ছিল তাদের বাজীর বিষয়। সবাই জানেন, এর রং ফুটফুটে সাদা। তবু কদ্রু বললেন, না, এর সারাদেহ সাদা

হলেও লেজ কাল। এমন অসম্ভব কথা বিনতা মানবেন কেন? তিনি বললেন, না সাদা। দুজনেই জেদ করে বাজী রাখলেন, যে হারবে সে অন্যের দাসী হয়ে থাকবে আজীবন।

পরদিন ভোরবেলা দু'জনে গেলেন ইন্দ্রের অশ্ব দেখেতে। কিন্তু কদ্রু যে নিষ্ঠুর পরিকল্পনা করেই বাজী রেখেছেন, তা কল্পনাও করতে পারে নি বিনতা। রাতারাতি কদ্রু তার ছেলেদের পাঠিয়ে দিলেন উচ্চৈঃশ্রবার কাছে। তারা গিয়ে তাকে রাজি করিয়ে লেজ ধরে ঝুলে রইল। মনে হ'ল লেজটি বুঝি সত্যিই কালো। ভোরের আলোতে দূর থেকে সেই কালো লেজ দেখে হার মানলেন বিনতা এবং কদ্রুর দাসী হ'লেন।

এর অনেক পরে জন্মাল বিনতার দ্বিতীয় পুত্র। এ মহাশক্তিমান। নাম গরুড়।

গরুড় অবশেষে কদ্রুকে খুশী করে তার মাকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত করল। আর সাপেদের ছলনাতে তার মাকে এতদিন দাসীত্বে কাল কাটাতে হয়েছে জেনে, সে হয়ে উঠল সর্পভুক।

নাগরাজ বাসুকী কিছুতেই গরুড়কে কোনক্রমে নিবৃত্ত করতে না পেরে প্রস্তাব করলেন, হে গরুড়! তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

কি প্রার্থনা? গরুড় জিজ্ঞাসা করল।

তুমি নিত্য পাতালে এসে এমনি করে নাগলোকে অত্যাচার ক'রো না। তার বদলে আমি প্রতিদিন দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে তোমার আহার্য-রূপে একটি করে সাপ পাঠিয়ে দেব।

গরুড় দেখল, এ মন্দ নয়। এতে নিয়ত সর্পকুল গরুড়-ভয়ে ভীত থাকবে আর রাজা নিজেও যে ভীত তা প্রমাণিত হবে। গরুড় বল্‌ল, বেশ তাই হবে।

সেই থেকে প্রতিদিন নাগরাজ বাসুকী একজন করে নাগ পাঠান আর গরুড় তাদের খেয়ে নেয়। এই হাড়ের পাহাড় সেই নাগেদের।

এ কথা শুনে জীমূতবাহনের মন বেদনায় ভরে উঠ্‌ল। সে বল্‌ল বিভৎস! বিভৎস!

মিত্রাবসু বল্‌ল, কি ?

জীমূতবাহন বল্‌ল, গোটা ব্যবস্থাটাই।

কেন ? মিত্রাবসু জানতে চাইল।

জীমূতবাহন বল্‌ল: দেখ, নাগরাজ বাসুকী নিত্য নিজের একজন করে প্রজাকে অসহায়ভাবে মরতে পাঠান। তার মা-বাবা-ভাইবোন-স্ত্রীর বুকফাটা কান্না কি তাঁর কানে পেঁছায় না ? শুনেছি বাসুকীর সহস্র ফণা। তার একটিও কেন তিনি দান করলেন না গরুড়কে। কাপুরুষের মত নিজে নিরাপদে জীবিত থেকে অন্য অসহায়কে ঠেলে দিলেন ! এ কি বিভৎস নয় ?

আবার ভাব, গরুড়ের কথাই ভাব। তিনি মহর্ষি কাশ্যপের পুত্র। মহাবীর। বিষ্ণুর বাহন। কোন্‌ নীতিতে তিনিও নিত্য একটি করে নাগকে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে বাধ্য করেন ! মৃত্যু এলে তাকে বরণ করাই কষ্টকর। কিন্তু মৃত্যু আসবার আগে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করার কি যন্ত্রণা তা কি তিনি জানেন না ! তবু কি একে তাঁর বিভৎস বলে বোধ হয় না !

সেদিন তারা ফিরে গেল নিজ নিজ আবাসে। পরদিন ভোরে স্নান সেরে জীমূতবাহন চলে এলেন সেই হাড়ের পাহাড়ের কাছে। তাঁর মনের সঙ্কল্প এই যে আত্মদান করে অন্ততঃ একজন নাগেরও প্রাণ বাঁচাবে আর যদি গরুড়কে এ পাশ থেকে নিবৃত্ত করা যায়, তবে আরও ভাল।

এই ভেবে জীমূতবাহন চলে এল সেই হাড়ের পাহাড়ের কাছে। একটু পরেই তাঁর কাছে এলো করুণ কান্নার শব্দ। কে কাঁদে! একটু খুঁজতেই একটা টিলার ওপরে এক নাগ যুবককে দেখা গেল। পাশে এক বৃদ্ধা। বৃদ্ধাটিই করুণ স্বরে কাঁদছে আর যুবকটি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে।

জীমূতবাহন এগিয়ে গেল। তাকে দেখে বৃদ্ধা চেঁচিয়ে উঠল, হে গরুড় তুমি আমার পুত্রকে মুক্তি দাও। পরিবর্তে আমাকে গ্রহণ কর।

জীমূতবাহন বুঝল যে, তাহলে ঐ যুবককেই সে দিনের খাদ্য

হিসাবে পাঠান হয়েছে, আর এই বৃদ্ধা তার মা। তাকে গরুড় ভেবেছেন শোকাতুরা জননী। জীমূতবাহন বলল, মা! ভয় নেই। আপনার পুত্রকে আমি রক্ষা করব।

বৃদ্ধা বলল, কে তুমি বাবা!

জীমূতবাহন বলল, আমি এক সামান্য জন। লোকহিত ব্রত আমার। মা, আমি আপনার পুত্রের বদলে গরুড়ের খাদ্য হয়ে, আপনার পুত্রকে মুক্তি দেব। আপনি তাকে নিয়ে বাড়ি যান।

বৃদ্ধা আনন্দে একবার হেসে উঠল, তারপর কাঁদল। পুত্রকে বলল, শুনেছিস শঙ্খচূড়! এ কি বলে।

শঙ্খচূড় বলল, মা, ওঁর কথা শুনেও কি বুঝলে না যে উনি কতবড় মহাপুরুষ। ওঁর জীবনের বিনিময়ে আমি বাঁচতে চাই না মা। অমন হীরের বদলে এ কাঁচ বাঁচিয়ে রেখে লাভ! বলে জীমূতবাহনকে প্রণাম করল শঙ্খচূড়। বলল, হে ভগবান্! মৃত্যুর আগে আপনাকে দেখতে পেলাম, এতে আমার মনোবল ফিরে এসেছে। এবার গরুড়ের তৃপ্তির জন্য আত্মোৎসর্গ করে আমার কোন ক্লেশ থাকবে না।

বৃদ্ধা বলল, বাবা! আমাদের এই বিচ্ছেদের সময় তুমি যে স্বর্গের ছোঁয়া দিলে, তাতেই সব অমৃত হয়ে গেছে। আর আমার পুত্রশোক নেই।

এই বলে কান্না ভুলে, শোক ভুলে মাতা পুত্রে গিয়ে বসল গোকর্ণদেবের পূজা করতে। আর জীমূতবাহন ভাবতে থাকল, জনহিতার্থে প্রাণদানের এত বড় সুযোগটা তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল!

এমন সময় গাছপালায় লাগল ঝড়ের মাতন। আকাশ যেন ঢেকে যেতে থাকল অন্ধকারে। জীমূতবাহন বুঝল গরুড় আসছে। সে এতটুকু সময় অপচয় না করে দৌড়ে গিয়ে চাদর দিয়ে গা ঢেকে বসল বধ্যশিলার ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গেই গরুড় এক ছোঁতে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বসল মলয় পর্বতের এক চূড়ায়। যাবার পথে জীমূতবাহনের শিরোমণিটি ছিঁড়ে কয়েক ফোঁটা রক্তের সঙ্গে পড়ল মলয়বতীরই সামনে।

মলয়বতী সেটি দেখেই চিনল। শিরোমণি তার স্বামীর। কিন্তু সঙ্গে রক্তের ফোঁটা কেন? সে তাড়াতাড়ি মণি নিয়ে দেখাল শ্বশুর-শাশুড়ীকে। রাজা জীমূতকেতু এবং কনকবতীও শিরোমণি দেখে চমকে উঠলেন। তারা ধ্যানযোগে সব জেনে পুত্রবধূকে নিয়ে ছুটলেন মলয় পর্বতের সেই চূড়ার দিকে!

অন্যদিকে গোকর্ণদেবের ধ্যান শেষ করে শংখচূড় এসে আর দেখতে পেল না জীমূতবাহনকে। অথচ বধ্যশিলায় রক্ত! সর্বনাশ! তা হলে তো সেই মাহাত্মাই তার বদলে আত্মদান করেছেন! শংখচূড় রক্তের দাগ নিশানা করে ছুটল মলয় পর্বতের দিকে।

জীমূতবাহনকে খেতে খেতেও গরুড় অবাক হলেন। আশ্চর্য, যাকে খাচ্ছেন, সে তো আদৌ কাতর হচ্ছে না। সে তো একবারও প্রাণভিক্ষা চাইল না! গরুড় আহার ত্যাগ করে খাদ্যের দিকে চাইলেন।

জীমূতবাহনের দেহে তখনও স্থানে স্থানে মাংস আছে। শত-ধারায় রক্ত বইছে। সে ভাবছে, প্রতি জন্মেই সে যেন এমন করে আত্মোৎসর্গ করতে পারে। ভাবতে ভাবতেই বোধ হ'ল, গরুড় খাওয়া বন্ধ করেছেন। কেন? জীমূতবাহন বলল, হে পক্ষীশ্রেষ্ঠ! এখনও তো আমার দেহে রক্তমাংস আছে। তবে তৃপ্ত হবার আগেই আপনি থামলেন কেন?

পক্ষীরাজের সন্দেহ দৃঢ় হ'ল। তিনি বললেন, আপনার সত্য পরিচয় দিন। আপনি তো নাগ নন। তবে কেন বধ্যশিলায় বসে আমাকে প্রতারিত করলেন?

গরুড়ের কথা শেষ হতে না হ'তে শংখচূড় দূর থেকে চিৎকার করতে করতে সেখানে ছুটে এলো। কাছে এসে বলল, হে গরুড়! আজ আমিই আপনার ভক্ষ্য—উনি নন। আমি ইষ্টদেব বন্দনায় বসেছি, সেই ফাঁকে এই মহাত্মন্ আমাকে বাঁচাতে বধ্যশিলায় গিয়ে বসেছিলেন।

এমন সময় জীমূতকেতু কনকবতী এবং মলয়বতীও সেখানে এসে পড়লেন। তারা জীমূতবাহনের সেই রুধিরাপ্লুত দেহ দেখে ডুকরে

কেঁদে ফেললেন। জীমূতকেতু বললেন, হায় পুত্র! তুমি পরোপকারের জন্য এমনি করে তোমার জীবন বিলিয়ে দিলে! আর হে গরুড়! তুমিই বা কোন বুদ্ধিতে ত্রিলোকবিশ্রুত জীমূতবাহনকে এমন করে শেষ করলে!

অনুশোচনায় গরুড় পাগল হয়ে উঠলেন। বললেন, আগুনে প্রাণ বিসর্জন ভিন্ন আমার প্রায়শ্চিত্ত নেই।

মলয়বতী দেবী চণ্ডীকে স্মরণ করে কাতর কণ্ঠে বললেন, হে দেবী! তুমি যে বলেছিলে, আমার স্বামী সুদীর্ঘজীবী হবেন, তা হ'ল কৈ?

দেবী আবির্ভূতা হয়ে বললেন, আমার কথা মিথ্যা হবার নয়। এই দেখ জীমূতবাহন তাঁর পূর্বদেহ ফিরে পেয়েছে।

জীমূতবাহন বলল, দেবী আমি এজীবন গ্রহণ করতে পারি যদি গরুড় প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি আর সর্প ভক্ষণ করবেন না, আর যাদের অস্থি এখানে সঞ্চিত আছে, তারা বেঁচে উঠবে; তবেই আমি এপ্রাণ গ্রহণ করব।

গরুড় বললেন, আপনার শর্তে আমি সম্মত। আমি আর সাপ খাব না। আর আমিও চাই যে এরা বেঁচে উঠুক।

দেবীর কৃপায় নাগেরা বেঁচে উঠল। সকলে জীমূতবাহনের এই অদ্ভুত আত্মত্যাগের গল্প ত্রিলোকে বলে বেড়াতে থাকল।

সমাপ্ত